প্রখ্যাতনামা গৌড়েশ্বর হোসেন শা'র জীবনকাহিনী নিয়ে রচিত এই পালানাটক অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়েছিল জনতা অপেরা ও ভোলানাথ অপেরায়। হোসেন শা প্রথম জীবনে সুবুদ্ধি রায়ের ক্রীতদাস ছিলেন। শৌর্য্য ও কুশাগ্রবুদ্ধির বলে তিনি গৌড়ের মসনদ অধিকার করেন। গৌড়ের সুলতানদের মধ্যে এমন বহু আলোচিত ও বিতর্কিত শাসক বোধহয় আর কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন অসংখ্য গুণের আধার। গৌড়ের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির সিংহভাগ তখন ভোগ করত বিদেশী আমলারা; প্রকৃতপক্ষে তারাই ছিল এ দেশের ভাগ্যবিধাতা। হোসেন শা'র আমলেই এই বিদেশীর প্রভুত্বের অবসান হয়। কিন্তু তাঁর অসংখ্য কৃতিত্ব প্রায় ঢাকা পড়েছিল একটা কুকীর্ত্তির আড়ালে। বৈষ্ণবদের উপর তিনি অকথ্য নির্য্যাতন চালিয়েছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ তাঁর হাতে বিধ্বস্ত হয়েছিল। বহু দোষগুণে গড়া এই মানুষটির জীবন সত্যই ছিল নাটকীয়। অভিনয়ের সুবিধার জন্য এ নাটক তিন অংকে ভাগ করা হয়েছে।

নাটকখানি যাত্রারসিকদের সমাদর লাভ করলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

ইতি—

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নাটক—

কান্না-ঘাম-রক্ত—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। সামাজিক নাটক। পার্কে বসে আছেন সত্যবাবু। চোখে বোবা-বেদনার ছায়া। কারণ বড়ছেলে ভুবন বাড়ী থেকে চলে গেছে, উৎপল দত্তের সুন্দরী বোন ইলোরাকে বিয়ে করে। ছোটছেলে রতনের কলেজে পড়া বন্ধ। বড় মেয়ে আলোর চোখে জল। ছোট মেয়ে ছায়ার বুকে আধুনিকতার আগুন। পাড়ার বেকার ছেলে পান্না, হীরে, চুণী পার্কে ভীড় জমায়, তরুণী মেয়েদের দেখলে সিগারেটের ধোঁয়ার রিং ছাড়ে। সত্যবাবু দেখেন—দেখেন, ম্যাথর সুশান ঝাঁটা-প্যান হাতে ময়লা পরিষ্কার করতে আসে। কিন্তু উৎপল মিত্র, দশরথ কণ্ট্রাকটার, ইঞ্জিনিয়ার ভুবনের মনের ময়লা কি কোনদিন পরিষ্কার হবে? সত্যবাবু ভাবেন—ফেরিওয়ালা জীবন গান গায়—'হিসাব কষে দেখনা শেষে কি পেলাম'। সমাজের আয়নার প্রতিচ্ছবির মত দুরন্ত মেয়ে আয়না আসে। ঈশ্বর কাঁদে, দার্শনিক ভাস্কর হাসে, চক্রান্তকারী মাধব দত্ত চক্রান্তের জাল বোনে। কিন্তু সত্যবাবু দেখেন— নব জাগ্রত যুবগোষ্ঠির সেবায় প্রতিজ্ঞায় থেমে যায় কান্না, বন্ধ হয় ঘাম, জমাট বাঁধে সমাজবিরোধীদের বিষাক্ত রক্ত।

সংগ্রাম বা আঁধার ঘরের আলো—শ্রীকানাইলাল নাথ প্রণীত। অশ্রুঝরা সামাজিক নাটক। অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর যশের উৎস। লোভ মানুষকে যে কত নীচে নামাতে পারে, তারই জীবন্ত আলেখ্য আঁধার ঘরের আলো। বল্লভপুরের জমিদার উইল করে গেলেন, চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে বিবাহ না করলে জ্যেষ্ঠপুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণ হবে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। কুলগুরু জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী, মাতুল কালিকাপ্রসাদ, এমন চক্রান্ত করলেন, যে বীরেন্দ্রের বিবাহ করা না হয়। নিয়তি অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে হাসল। শুভলগ্নে দরিদ্রের মেয়ে আলোর সঙ্গে বিবাহ হল জমিদারপুত্র বীরেন্দ্রের। সে বিবাহে আলো কি সুখী হতে পেরেছিল? জলেছিল কি আঁধার ঘরে আলো?

—পুরুষ—

সুবুদ্ধি রায়	...	...	জায়গীরদার।
সুদর্শন	...	...	ঐ পুত্র।
আলাউদ্দিন	...	...	সুবুদ্ধি রায়ের ক্রীতদাস। [পরে নবাব হোসেন শা]
আবদুল মজিদ	...	...	গৌড়ের নবাবের পুত্র।
চাঁদ কাজী	...	...	নবাবের সম্ভ্রান্ত অমাত্য।
তালপাত সিং	...	...	ঐ ভৃত্য।
আলি আব্বাস	...	...	সিপাহশালার।
আফজল খাঁ	...	...	মহালদার।
পরাগল খাঁ, পুরন্দর	...	...	মনসবদার।
গোলাম রসুল	...	..	হাবিলদার।
ইয়াহিয়া	..	...	সৈনিক।

—স্ত্রী—

শঙ্করী	...	...	সুবুদ্ধি রায়ের স্ত্রী।
কুসুম	...	...	ঐ কন্যা।
জুলিয়া	...	...	মজিদের বেগম।
আমিনা	...	...	চাঁদ কাজীর কন্যা।

—:০:—

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নাটক—

রক্ত-স্নাত বাংলাদেশ বা জল্লাদের বিচার—সংগ্রামী নাট্যকার রঞ্জন দেবনাথের অবিস্মরণীয় নাট্যসৃষ্টি। বর্ব্বর জঙ্গীশাহীর অত্যাচারে সাড়ে সাতকোটি বাঙালী যখন মৃত্যুর প্রহর গুণছে,লক্ষ লক্ষ তরুণের বুকের রক্তে রাঙা হল জাহাঙ্গীর নগরের শ্যামল মাটি, লুণ্ঠিত হল মা-ভগ্নীর ইজ্জৎ, লক্ষ লক্ষ মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে এলো ভরত-পুরের দিকে—গর্জ্জে উঠল ছাত্রনেতা বাবা সিদ্দিকি। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, আমরা প্রাণ দেব, তবু স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেব না। রক্ত দেব, তবু বর্ব্বর জঙ্গীশাহীর বুটের তলায় মাথা নত করব না। আমরা বাঙালী, স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। ত্রিরিশ লক্ষ মানুষের বুকের রক্তে পৃথিবীর মানচিত্রে জেগে উঠল একটা নতুন দেশ। সে দেশের নাম—রক্তস্নাত বাংলাদেশ।

জানোয়ার—শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। লোকনাট্যের উজ্জ্বল দীপশিখা। সামাজিক নাটক। পিয়ালীর জঙ্গলে জানোয়ার মারতে এসেছে কলকাতার মেয়ে ঈশিতা। হাতে রাইফেল, চোখে বাইনাকুলার, বুকে নগর সভ্যতার প্রচণ্ড অহঙ্কার। সহসা তার সামনে দাঁড়াল বুনো বর্ব্বর অরণ্য সেন। মেয়েটি যত সুন্দরী, ছেলেটি তত কুৎসিত। কে তুমি? আমি অরণ্য। কি দেখছ? তোমাদের মেকী সভ্যতা। সাটি-আপ জানোয়ার। সহরের শিক্ষিতা সুন্দরী তরুণী গ্রাম বাংলার বুনো তরুণ অরণ্যকে দিল অসম্মানের আঘাত। ছেলেটি ফেটে পড়ল নগর সভ্যতার বিরুদ্ধে। চা বাগিচার দেহাতী যুবতী পাখী নেশায় মাতাল হয়ে গেয়ে ওঠে "না—না, দিও না মালা..." সঙ্গীত পাগল টুকুন গায়,—"কোন এক গাঁয়ে এক ছিল মা..." আমরা বিস্ময়াবিভূত চোখে দেখি সুন্দরী ঈশিতাকে। অরণ্য বলে, ওগো উলঙ্গ সভ্যতা, তোমার দুরন্ত গতি থামাও।

সোনা বৌ—শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কালিকা নাট্য কোম্পানীর যশের উৎস। সামাজিক নাটক।

নবাব হোসেন শা

—:(*):—

সূচনা

সুবুদ্ধি রায়ের প্রাসাদের বহিরঙ্গণ।

ঝুড়ি কোদাল লইয়া আলাউদ্দিনের প্রবেশ। হাতে একটি পাকা পেয়ারা।

আলাউদ্দিন। জয় হক বাবা গাছের পো; ঠিক সময় বুঝে একটি পাকা পেয়ারা ফেলে দিয়েছ। আগে ত পেটে খাই, তারপর পিঠে সইব। এত বেলায়ও যখন কাজ শেষ হল না, তখন বাবা-ঠাকুর আজ পিঠের ছাল তুলে নেবে। যায় প্রাণ, ভিক্ষে মেগে খাব। [পেয়ারায় কামড় দিল] না—না, এমন পাকা ফল আমি খাব নি। বোনটির জন্য রেখে দিই। সে খেয়ে খুশী হলেই আমার পেট ভরবে। ["হুম হুম" করিয়া কোদাল পাড়িতে লাগিল]

কুসুম। [নেপথ্যে] ভাইজান,—

আলাউদ্দিন। যা বাবা, হয়ে গেল কাজ।

কুসুমের প্রবেশ।

কুসুম। ও ভাইজান, আবার তুমি কোদাল পাড়তে শুরু করেছ? ঘাসগুলোর বুঝি ব্যথা লাগে না?

আলাউদ্দিন। লাগলে কি করব? ওরা ফলের গাছগুলোকে

বাড়তে দিচ্ছে নি যে। তুমি দিদি আবার এ সময়ে এলে কেন বল ত! বাবাঠাকুর বলেছে দুপুরের আগে পুকুরপাড় সাফ করে ফেলতে হবে।

কুসুম। আরে দূর, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে এক ফকির কি সুন্দর গান গাইছে, শুনবে এস না।

আলাউদ্দিন। তুমি শুনে এস, আমি তোমার কাছে শুনব এখন। কি গান বল ত।

কুসুম। শুনে শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।

আলাউদ্দিন। তবে ত আর কথাই নেই। তুমিও গাইতে থাক, আমিও কাজ করতে থাকি।

[আলাউদ্দিন কোদাল পাড়িতে লাগিল, কুসুম গাহিতে লাগিল।]

কুসুম। গীত:

কে মুছাবে অশ্রু মায়ের, বাংলাদেশে মানুষ নাই,
শ্মশান হল সোনার মাটি, কোনদিকে পথ, কোথায় যাই?

[আলাউদ্দিন নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল, কুসুম গাহিতে লাগিল।]

কুসুম। পূর্ব্বগীতাংশ:

অসংখ্য মার জোয়ান ছেলে,
দেখছে না কেউ আঁখি মেলে,
আপন ঘরে পরবাসী হায় বাঙালী ভগ্নী ভাই।
ভিনদেশী সব নিচ্ছে লুটে,
দেশের মানুষ মজুর-মুটে,
তাদের মুখে ক্ষীর ননী সর, যার মাটি তার মুখে ছাই।

আলাউদ্দিন। তাই বটে দিদি। বাঙালীর সব আছে, তবু কিছু নেই।

কুসুম। ও ভাইজান, তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে যে।

আলাউদ্দিন। না দিদি, না। এই ত নিয়ম। দেখছ না, গরুর বাঁটে কত দুধ জমে, তার বাছুরটা একফোঁটা খেতে পায় না। গাছের ফল, পুকুরের মাছ, ক্ষেতের ফসল সব হাবশীরা খেয়ে সাবাড় করে দিলে, আর যাদের ব্যাসাত তারা না খেয়ে মচ্ছে। আমি যদি নবাব হতুম—

কুসুম। তুমি নবাব হবে কি? তাহলে আমায় ফল পেড়ে দেবে কে?

আলাউদ্দিন। ঠিক—ঠিক, আমি ওই জন্তেই নবাব হতে পাচ্ছি নি। এই নাও, তোমার জন্তে কি মিষ্টি একটা পেয়ারা রেখে দিয়েছি। কিন্তু—

কুসুম। ফিরিয়ে নিচ্ছ যে?

আলাউদ্দিন। থাক—থাক, এ পেয়ারা তুমি খেয়ো না দিদি! আমি তোমায় দশটা পেয়ারা পেড়ে দেব। এটাতে আমি ভুলে কামড় দিয়ে ফেলেছিলুম।

কুসুম। তাতে হয়েছে কি?

আলাউদ্দিন। না, হয় নি কিছু? তবে আমি মোছলমান কিনা।

কুসুম। মোছলমান কে বললে? তুমি ত মানুষ।

আলাউদ্দিন। ঠিক…ঠিক। আমরা কেউ হিন্দু নই, মোছলমান নই, আমরা মানুষ। এই নাও, পেয়ারা নিয়ে সরে পড়; আমি একটু কাজ করি।

[কুসুম পেয়ারা খাইতে খাইতে চলিয়া গেল। আলাউদ্দিন আবার কোদাল পাড়িতে লাগিল।]

আফজলের প্রবেশ।

আফজল। এই ছোকরা,—

আলাউদ্দিন। সরে যাও মিঞা, কাজ করতে দাও।

আফজল। চুলোয় যাক তোর কাজ। চলে আয় জলদি।

আলাউদ্দিন। কোথায়?

আফজল। আমার গাড়ীর চাকা মাটিতে বসে গেছে।

আলাউদ্দিন। বসতে দাও।

আফজল। টেনে তুলে দিবি আয়।

আলাউদ্দিন। তুলে দেব? গাড়ীর চাকা? আমি!

আফজল। তুই একা তুলবি কেন? আরও দুজন আছে। হাঁ করে রইলি যে? আয় বলছি।

আলাউদ্দিন। খাঁ সাহেবকে ত চিনতে পাচ্ছি নি।

আফজল। চিনতে পাচ্ছ না? চাবুকের ঘায়ে চিনিয়ে দেব। আমি মহালদারের আফজল খাঁ।

আলাউদ্দিন। ও, আপনিই সেই আফজল খাঁ? অনেকদিন আপনাকে দেখবার সাধ ছিল। এতদিনে সাধ মিটল। সেলাম হাবশী সাহেব।

আফজল। ব্যাটা দেরী কচ্ছিস কেন? আয় না।

আলাউদ্দিন। কি করে যাব? দেখছ ত মনিবের কাজ করছি।

আফজল। তোর মনিবের মাথায় আমি পয়জার মারি।

আলাউদ্দিন। তা ত মারবেই। তোমরা হাবশীরাই ত দেশের মালিক। নবাব ত থেকেও নেই। তা নইলে দেশের এ দশা হবে কেন?

আফজল। কি বললি বদমায়েস?

আলাউদ্দিন। বলছি তোমার গাড়ীর চাকায় তুমি নিজে গিয়ে কাঁধ দাও। আমি তোমার চাকর নই যে তোমার হুকুমে পড়ি কি মরি করে ছুটব।

আফজল। যাবি না ব্যাটা?

আলাউদ্দিন। না রে ব্যাটাচ্ছেলে। হাবশীর কাজ যে করে, সে শালার ঘরের শালা।

আফজল। তবে রে শয়তানের বাচ্চা,—মহালদারের কথা শুনবি না তুই? তোকে আমি খুন করব। [আগ্নেয়াস্ত্র বাগাইল]

আলাউদ্দিন। দুত্তোর হাবশীর নিকুচি করেছে। [আগ্নেয়াস্ত্র কাড়িয়া ফেলিয়া দিল]

চাঁদ কাজীর প্রবেশ।

চাঁদ কাজী। সাবাস মরদের বাচ্চা। হাতখানা মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে নাকি আফজল খাঁ?

আফজল। আরে দূর কাজীর পো। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে এল। ব্যাটাকে ধরে দু'ঘা দিতে পারলেন না?

চাঁদ কাজী। চেপে যাও মিঞা। শীগগির ছুটে যাও। নবাব সাহেব নূরমহলে এসে গেছেন।

আফজল। এসে গেছেন ত হয়েছে কি? উড়ে ত যেতে পারি নে। গাড়ীর চাকা মাটিতে বসে গেছে।

চাঁদ কাজী। এতক্ষণে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। যাও—যাও, দেরী হলে নবাব হয়ত হাতে মাথা নেবেন।

আফজল। কত ব্যাটা মাথা নিলে, এখন বাকি আছে মুজাঃফর

শা। আচ্ছা, আজ আমি চলে যাচ্ছি এরপর একদিন এসে এই ভেড়ীর বাচ্ছাদের ভাল করে শিক্ষা দিয়ে যাব।

[প্রস্থান।

[আলাউদ্দিন একমনে কোদাল পাড়িতেছিল। চাঁদ কাজী তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন।]

চাঁদ কাজী। ওহে, শুনছ?

আলাউদ্দিন। শোনবার সময় নেই।

চাঁদ কাজী। দূর ছোকরা, আমার মাথায় কোদাল পাড়বে নাকি? কার কাজ করছ তুমি?

আলাউদ্দিন। বাবাঠাকুরের।

চাঁদ কাজী। কে বাবাঠাকুর?

আলাউদ্দিন। ওই যে গো, রাজা সুবুদ্ধি রায়।

চাঁদ কাজী। কতদিন আছ এখানে?

আলাউদ্দিন। বরাবরই আছি।

চাঁদ কাজী। কত বেতন পাও?

আলাউদ্দিন। বেতন! [মুখ তুলিয়া কপালের ঘাম মুছিল] কই, বেতনের কথা ত শুনি নি।

চাঁদ কাজী। কি রকম ছেলে তুমি? তোমার বাপ-মা আছে ত?

আলাউদ্দিন। মা নেই। বাপ ছিল, সে আমায় বেচে দিয়ে তীর্থ করতে চলে গেছে।

চাঁদ কাজী। তুমি তাহলে সুবুদ্ধি রায়ের ক্রীতদাস?

আলাউদ্দিন। দাস হব কেন? আমি মোছলমান।

চাঁদ কাজী। কি নাম তোমার বাবা?

আলাউদ্দিন। নাম একটা ছিল,—সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন খাঁ। ওসব কারও মনে নেই; সবাই বলে আলাউদ্দিন।

চাঁদ কাজী। সৈয়দ বংশের ছেলে তুমি, হিন্দু জায়গীরদারের ক্রীত-দাস? ছি-ছি-ছি, এ যে সমগ্র মুসলমান সমাজের কলংক। কেমন নিষ্ঠুর তোমার পিতা? তোমাকে বিক্রি করে দিয়ে তীর্থ করতে চলে গেল? কত টাকায় বিক্রি করেছে বলতে পার?

আলাউদ্দিন। ওসব বাবাঠাকুর জানে। এখন সরে পড় দেখি, আমি কাজ করি। বাবাঠাকুর দেখতে পেলে চাবুক মারবে।

চাঁদ কাজী। চাবুক মারে তোমায়?

আলাউদ্দিন। কাজ না করলে মারবে না? ইয়ার্কি?

চাঁদ কাজী। দুবেলা খেতে দেয় ত?

আলাউদ্দিন। দুবেলা খাব কোন্ দুঃখে? সারাদিনই ত খাই। মা ঠাকরুণ কাছে বসিয়ে খাওয়ায়। মার খেয়ে পিঠ কেটে গেলে নিজের হাতে তেল মালিশ করে দেয়। আর ওই যে আমার বোনটি, সে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে,—"ষাট ষাট"। কি দেখছ?

চাঁদ কাজী। ফকির কুতব-উল-আলম ঠিকই বলেছেন, এ এক ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নি। বালক তুমি জান না,—তুমি সিংহশাবক, কুকুরের মত ঘৃণ্য জীবন যাপন করতে তোমার জন্ম হয় নি। হজরৎ রসুলের বংশধর তুমি, তোমাকে মানুষ হতে হবে।

আলাউদ্দিন। কি বলছ?

চাঁদ কাজী। হজরতের পবিত্র রক্ত এমনি করে আমি অবহেলায় ব্যর্থ হতে দেব না। যত টাকা লাগে লাগুক, সুবুদ্ধি রায়ের কাছ থেকে আমি তোমার মুক্তি ক্রয় করব।   [প্রস্থান।

সুবুদ্ধি। [নেপথ্যে] আলাউদ্দিন,—

আলাউদ্দিন। যাই বাবাঠাকুর।

সুবুদ্ধি রায়ের প্রবেশ।

সুবুদ্ধি। আলাউদ্দিন,—

আলাউদ্দিন। এই যে বাবাঠাকুর। একটু দেরী হয়ে গেছে। দুপুরের মধ্যেই সব কাজ শেষ হয়ে যাবে।

সুবুদ্ধি। কাজ থাক বাঁদর। এত বাড় বেড়েছে তোর যে কুসুমকে তোর উচ্ছিষ্ট ফল খাইয়েছিস?

আলাউদ্দিন। আমি দিতে চাই নি বাবাঠাকুর, বোনটি না নিয়ে ছাড়লে নি।

সুবুদ্ধি। আমি তোকে খুন করব বদমায়েস। [কশাঘাত]

আলাউদ্দিন। বুঝতে পারি নি বাবাঠাকুর। আর মেরো নি। নাক কাণ মলছি, এমন কাজ আর আমি কখখনো করব নি। উঃ—উঃ, বাবাঠাকুর!

সুবুদ্ধি। জাহান্নামে যা শয়তান। [কশাঘাত, আলাউদ্দিনের ছুটাছুটি]

চাঁদ কাজীর প্রবেশ।

চাঁদ কাজী। করেন কি রায়জি? মরে যাবে যে।

সুবুদ্ধি। মরুক।

চাঁদ কাজী। মরে গেলে আপনার এত কাজ করে দেবে কে?

সুবুদ্ধি। চাইনে আমার কাজ।

[আলাউদ্দিন চোখের জল মুছিয়া আবার কোদাল পাড়িতে লাগিল ও মাঝে মাঝে "উঃ আঃ" করিতে লাগিল।]

চাঁদ কাজী। তাই যদি হয়, ছোঁড়াটাকে আমায় দিয়ে দিন রায়জি। কতটাকা দিয়ে কিনেছিলেন?

সুবুদ্ধি। এক হাজার টাকা দিয়ে।

চাঁদ কাজী। আমি আপনাকে দু'হাজার টাকা দেব।

সুবুদ্ধি। টাকা লাগবে না কাজীসাহেব। আমি আপনাকে এমনি দিয়ে দিচ্ছি। আর ওকে আমার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ দুরন্ত শয়তানকে আপনি সামলাতে পারবেন না কাজীসাহেব। রেগে গেলে ওর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। কখন যে কার মাথায় বাড়ি দিয়ে বসবে, তার ঠিক নেই।

চাঁদ কাজী। সব ঠিক হয়ে যাবে। হাজার হক সৈয়দ বংশের ছেলে, শিক্ষা-দীক্ষা পেলে হয়ত একদিন মানুষ হবে।

সুবুদ্ধি। তবে নিয়ে যান। ওরে, ও ভূত, আর কাৎরাতে হবে না। হাত-পা ধুয়ে আয়, আজ তোর মুক্তি। [চাবুক ফেলিয়া দিলেন]

আলাউদ্দিন। গোঁসা করো নি বাবাঠাকুর। আমি এখনি সব কাজ করে দিচ্ছি।

চাঁদ কাজী। আর তোমায় কাজ করতে হবে না। আজ তোমার দাসত্বের অবসান। চল বাবা আমার সঙ্গে।

আলাউদ্দিন। হাত ছেড়ে দাও। চল বাবা আমার সঙ্গে। কেন, তোমার সঙ্গে যাব কেন?

সুবুদ্ধি। যা আলাউদ্দিন, কাজী সাহেবের সঙ্গে চলে যা। আজ থেকে তুই স্বাধীন।

শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। কে স্বাধীন? আলাউদ্দিন? এ তুমি কি বলছ?

সুবুদ্ধি। ঠিকই বলছি। তোমার টাকার পাখনা গজিয়েছিল, তাই এক হাজার টাকা দিয়ে একটা জানোয়ারের বাচ্ছা কিনে

নিয়ে এসেছিলে। দুধ-ঘি খাইয়ে গাধাকে হাতী বানিয়েছ। এবার ছেড়ে দাও, জাতভায়ের কাছে চলে যাক।

চাঁদ কাজী। আয়না রে বাপু।

শঙ্করী। তুমি কি পাগল হয়েছ? পাঁচ বছরের আধমরা একটা শিশুকে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি বাঁচিয়ে তুলেছি; বিশ বছর চোখে চোখে রেখে এতবড় করে তুলেছি, আজ ওকে তুমি বিদেয় করে দেবে? ওগো, ও যে আমার ঘরের ছেলে।

সুবুদ্ধি। এমনি করেই তুমি ওর স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছ। নইলে হতভাগা নিজের উচ্ছিষ্ট ফল মেয়েটার মুখে তুলে দিতে সাহস করত না।

শঙ্করী। জাতধর্ম্ম রসাতলে গেছে, না? জাত জাত করেই তোমরা শেষ হয়ে যাবে। হাবশীরা যে তোমাদের ঘরের মেয়েদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তার কোন প্রতিকার করতে তোমাদের তলোয়ার গুলো ত গর্জ্জে ওঠে না। দলে দলে হিন্দুরা তোমাদের অত্যাচারে ধর্ম্মত্যাগ করে চলে যাচ্ছে, তবু ত তোমাদের হুঁশ হয় না? আজ এই অভাগা ছেলেটাকে না তাড়িয়ে দিলে তোমার আর ঘুম হচ্ছে না। এত বাড়াবাড়ি ভাল নয় রাজা।

সুবুদ্ধি। কথা বাড়িও না। যান কাজীসাহেব, নিয়ে যান।

চাঁদ কাজী। এই দেখ। চোখের জল ফেলছিস কেন? চলে আয়।

আলাউদ্দিন। মা ঠাকরুণ, তুমি বাবাঠাকুরকে বুঝিয়ে বল। আর আমি এমন কাম করব নি। আমায় যেতে দিও না মা ঠাকরুণ। বোনটিকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব নি।

সুবুদ্ধি। ওই শোন,—

শঙ্করী। শুনেছি। তোমাদের বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর। যা বাবা, চলে যা। আঃ, পিঠে কত চাবুক মেরেছ গো? কে আর

তেল মালিশ করে দেবে? কে আর হাত বুলিয়ে দেবে? কাঁদিস নি আলাউদ্দিন। সৈয়দ বংশের ছেলে তুই, কেন আর দিনের পর দিন চাবুকের ঘা পিঠ পেতে নিবি? এখানে ক্রীতদাস ছাড়া কেউ তোকে কিছু বলবে না। যেখানে মানুষের পরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবি, সেইখানে চলে যা। মায়ের মতন তোকে পনের বছর লালন পালন করেছি। আমার আশীর্ব্বাদ মিথ্যে হবে না। তুই একটা মানুষের মত মানুষ হবি। [আলাউদ্দিন তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল] নিয়ে যান কাজীসাহেব, আপনাকে চাকর দিলুম না, আমার একটা ছেলেকেই দান করলুম।

[প্রস্থান।

চাঁদ কাজী। রাজা, আপনাকে কি আর বলব? আপনি বড় ভাগ্যহীন। আপনার এ ধর্ম্মনিষ্ঠা আলাউদ্দিন হয়ত ভুলে যাবে; কিন্তু আমি ভুলব না।

সুবুদ্ধি। চাঁদ কাজী কি ভুলবেন, আর কি ভুলবেন না, তাই নিয়ে সুবুদ্ধি রায় মাথা ঘামায় না। [প্রস্থান।

আলাউদ্দিন। সত্যিই চলে যেতে হবে? পনের বছরের ঠাঁই একদিনে শেষ হয়ে গেল? এ বাড়ী আর আমার বাড়ী নয়? কেন? এতই কি কসুর করেছি আমি? দেখ মিঞা, দেখ, এ বাড়ীর মাটি আমার পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরছে। ওই গাছগুলো আমিই রুয়েছিলাম। ওরা আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ওরে, আর তোরা আমায় মায়ায় বাঁধিস নি। আমি যাই, আমি যাই।

চাঁদ কাজী। [চাবুকটা তুলিয়া লইল] আয় বাবা, আয়।

[আলাউদ্দিনকে লইয়া প্রস্থান।

—:০:—

—বার বছর পরে—

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য।

রণস্থলের একপার্শ্ব।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—“জয় নবাব মুজাঃফর শার জয়। জয় সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন খাঁর জয়।”]

আদিনার প্রবেশ।

আদিনা। চুপ, চুপ কর। নবাব মুজাঃফর শার জয়, আলা-উদ্দিন হোসেন খাঁর জয়। গুষ্ঠীর মাথার জয়। খেয়ে দেয়ে আর যেন কাজ নেই। দশটা মসজিদ বানাও, পঞ্চাশটা দীঘি কাটাও, পাঁচটা দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা কর। তা নয়, খালি মারো, ধরো, মাথা নাও। কেন রে বাপু? মিলে মিশে শান্তিতে থাকতে ভাল লাগছে না? সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়?

তালপাতের প্রবেশ।

তালপাত। আরে, তুমি ছুটছ কেন বিবিসাহেবা? মরবে যে। যুদ্ধ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না?

আদিনা। পাচ্ছি ত। কিন্তু কার সঙ্গে কার যুদ্ধ হচ্ছে, সে কথাটা ত বুঝতে পাচ্ছি না।

তালপাত। যুদ্ধ হচ্ছে তোমার খসমের সঙ্গে।

আদিনা। খসমের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ! তুই গাঁজায় দম দিয়েছিস।

তালপাত। বাজে কথা বলো না।

আদিনা। নবাব যে তার মনিব রে।

তালপাত। মনিব হলে কি হয়? দেশের দুশমন ত বটে। ব্যাটা নবাব হাবশীদের হাতের পুতুল। হাবশীদের অত্যাচারে দেশের মানুষের আজ দুঃখের শেষ নেই।

আদিনা। কাণ্ডটা দেখ দেখি। আমি মামুর বাড়ী বেড়াতে গেছি, আর এর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে ব'স আছে? ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দ্দার! সুখে থাকতে ভাল লাগছে না? নবাব তাকে পেয়ার করে দশহাজারী মনসবদার করে দিয়েছে, আর উনি অমনি তার শিলনোড়া দিয়ে তারই দাঁতের গোড়া ভাঙ্গতে গেলেন? মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে যে।

তালপাত। কে কাকে তক্তা বানায় দেখ না। নবাবী সৈন্য পালাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ না?

আদিনা। কোথায় পালাচ্ছে? তফাতে এসে দম নিচ্ছে। তুই খাঁয়ের পোকে বলে আয়, কাজ নেই যুদ্ধ বিগ্রহ করে, মেরে তক্তা বানালে আমি সে তক্তা নিয়ে করব কি?

তালপাত। তুমি ঘরে চলনা।

আদিনা। কখখনো যাব না। খাঁয়ের পোকে ডাক্।

তালপাত। খাঁয়ের পোকে ডাক্! তোমার তলব শুনলেই সে তলোয়ার ফেলে ছুটে আসবে? সে বলে গেছে, নবাবকে খতম না করে আজ ফিরবে না।

আদিনা। নবাবও হয়ত বলে এসেছে, হোসেন খাঁকে তক্তা না বানিয়ে ফিরবে না।

[নেপথ্যে নবাবী ফৌজের জয়ধ্বনি,—"জয় নবাব মুজাঃফর শায় জয়।"]

আদিনা। ওরে বাবা, এ যে খালি নবাবী ফৌজের হুঙ্কার শুনছি? ও সিঙ্গি, তোর হুলুভায়ের হয়ে গেল নাকি? দুত্তোর লড়ায়ের নিকুচি করেছে। শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দে সিঙ্গি।

তালপাত। শ্বেত পকাতা ওড়াব কেন?

আদিনা। পকাতা নয় রে মড়া, পতাকা। শ্বেত পতাকা ওড়ালেই যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে। হাঁ করে চেয়ে রইলি কেন? তুই না ওড়াস, আমি ওড়াব। [তালপাত সিংয়ের লাঠি ছিনাইয়া লইয়া তাহার সাদা পাগড়ি খুলিয়া ফেলিল।]

তালপাত। এই, এই, এসব কি হচ্ছে? শাদা পকাতা—

আদিনা। ফের পকাতা? প—তা—কা, বুঝলি গোমুখ্যু? [লাঠির আগায় পাগড়ির কাপড় বাঁধিল]

তালপাত। সর্ব্বনাশ করলে। ও হুজুরাইন, হুলুভাই গোঁসা করবে! পকাতা উড়িও না বলছি।

আদিনা। ফের পকাতা বললে তোকে আমি খুন করব।

তালপাত। ও কাজীসাহেব, ও কাজীসাহেব, শীগগির আসুন। আপনার মেয়ে পকাতা তুলে সব গোলমাল করে দিলে।

[প্রস্থান।

আদিনা। কাঙালের ঘোড়া রোগ। ছিলে বামুনের ঘরের গরু, হয়েছ চাঁদ কাজীর জামাই, নবাব করে দিয়েছে দশ হাজারি

মনসবদার। তাতেও তোমার শান্তি নেই। তোমার আজ নবাবী না পেলে ঘুম হচ্ছে না। তালি দেওয়া জামা পরে এসেছিল মশায়। গায়ে খড়ি উঠত, মাথায় উকুন কিলবিল করত। বাপজান নবাব সাহেবের চাকরি জুটিয়ে দিলে, নিজের মেয়ের সঙ্গে সাদি দিয়ে রাজার হালে রেখে দিলে। আজ তার নবাবী চাই। হওয়াচ্ছি তোমায় নবাব। হো নবাবী ফৌজ, লড়াই বন্ধ করো। [পতাকা তোলার উদ্যোগ।]

চাঁদ কাজীর প্রবেশ।

চাঁদ কাজী। আদিনা! [পতাকা টানিয়া নামাইল] এ সব কি ছেলেমানুষি কচ্ছ?

আদিনা। ছেলেমানুষি আমি কচ্ছি, না তোমরা কচ্ছ? আমাকে মামুর বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে তোমরা নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছ?

চাঁদ কাজী। দেব না? মুজাঃফর শা রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

আদিনা। তাতে তোমার বাবার কি? তোমার ভাগে কিছু কম পড়েছে? তোমার জামাইকে সে কোথা থেকে কোথায় টেনে তুলেছে,—দেখতে পাচ্ছ না?

চাঁদ কাজী। পাচ্ছি। কিন্তু সে নবাবের অনুগ্রহ নয়, হোসেনের যোগ্যতার পুরস্কার। নবাব মদ্যপায়ী।

আদিনা। তার পয়সায় সে মদ খায়, তাতে কার কি?

চাঁদ কাজী। সে চরিত্রহীন।

আদিনা। সে ত নবাবী মসনদের দোষ। তোমার জামাই যদি নবাব হয়, তারও তিন কাহন বেগম হবে।

চাঁদ কাজী। বাজে কথা বলো না কন্যা।

আদিনা। কাজের কথাই বলছি, লড়াই বন্ধ করো।

চাঁদ কাজী। তা হয় না আদিনা। বাণিজ্যের তরী কূলে এসে পৌঁছেছে। নবাব মরবে, আজই মরবে, একদিনে তিন হাজার রাজ-কর্ম্মচারীকে সে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করেছে। এরপর ছিল আমাদের পালা। আজই তার রাজত্বের শেষ দিন।

আদিনা। বাপজান!

চাঁদ কাজী। তারপর তোমার খসম হবে বাংলার মহামান্য নবাব, আর তুমি হবে বঙ্গেশ্বরী আদিনা বেগম। তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

আদিনা। না। তোমাদের এসব কাণ্ডকারখানা দেখে আমার আকাশ ফাটিয়ে আর্ত্তনাদ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। তুমি না কাজীর ব্যাটা! তোমার বাপ কত বেইমানকে প্রাণদণ্ড দিয়েছে, আর তুমি তোমার জামাইকে বেইমানি করতে এগিয়ে দিলে? বন্ধ কর বাবা, যুদ্ধ বন্ধ কর। এই সহজ সরল মানবদরদী মানুষটাকে নিয়ে তুমি আর অধর্ম্মের ব্যাসাতি করো না বাবা।

চাঁদ কাজী। ঘরে যাও কন্যা। তোমার প্রলাপ শোনবার সময় আমাদের নেই।

[প্রস্থান।

আদিনা। ছোটলোক, ইতর। ভালমানুষের ছেলেকে যুদ্ধে টেনে এনে বেঘোরে মারবে। কাজীর বাচ্চা নয়, পাজীর বাচ্চা।

মানচিত্র হস্তে হোসেন শা'র প্রবেশ।

হোসেন। এইখানে পরাগল খাঁ, এইখানে পুরন্দর, এই বরকত-উল্লা, এইখানে ঘাঁটি আগলে বসে আছে দনুজমর্দ্দন। কোনদিকে

পালাবে নবাবী ফৌজ? মুজাঃফর শার সাধের রাজত্ব আজই ধূলিসাৎ করব। কাউকে আমরা ঘরে ফিরে যেতে দেব না। উপায় নেই শাহান্‌শা অনেক সহ্য করেছি আমরা, পাপের ভরা তোমার ষোল-কলায় পূর্ণ হয়েছে, আজ এইখানে তোমার কলঙ্কিত জীবনের অবসান হোক। [অগ্রসর হইলেন, আদিনার গায়ে ধাক্কা লাগায় সে পতনোন্মুখী হইল]

আদিনা। আরে, দূর মিঞা! আমি মুজাঃফর শা নাকি?

হোসেন। একি! আদিনা! তুমি কবে এলে?

আদিনা। আজই আসছি।

হোসেন। বেশ করেছ। কিন্তু তুমি রণস্থলে এলে কেন?

আদিনা। প্রেমালাপ করতে এলুম।

হোসেন। রণস্থলে!

আদিনা। নইলে আর তোমায় পাব কোথায়? নবাবের দশহাজারী মনসবদার হয়ে আর তো তোমার টিকি দেখবার জো নেই। খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল হল তার এঁড়ে গরু কিনে। দশহাজারী মন্‌সবদার না হয়ে তোমার সে হাবিলদারিই ভাল ছিল।

হোসেন। কি আবোল-তাবোল বকছ?

আদিনা। আবোল-তাবোল বকছি? কিসের জন্য তোমার মাথায় এ নবাবী খোয়াব জাগল? আমি কি নবাবের বেগম হতে চেয়েছি?

হোসেন। তুমি চাইবে কেন? এ হচ্ছে আমার কর্ত্তব্য।

আদিনা। তোমার গুষ্ঠীর মাথা। ক্ষমতার লোভ তোমায় পাগল করেছে। তোমার বুড়ো শ্বশুর আবার তোমার লোভের

আগুনে হাওয়া দিচ্ছে। তা নইলে তুমি অন্নদাতা মনিবের সঙ্গে নেমকহারামি কর?

হোসেন। নেমকহারামি নয় আদিনা। তুমি দেখতে পাচ্ছ না নবাব মুজাঃফর শা বাংলাদেশটাকে হাবশীদের হাতে বিলিয়ে দিচ্ছেন। বাংলার কোটি কোটি মানুষ আজ আপন ঘরে পরবাসী। এ দুঃসহ অবস্থা থেকে দেশটাকে উদ্ধার করব বলেই আমি নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছি।

আদিনা। ওঃ, দশটা নড়বড়ে তলোয়ার আর হাজার দুই কোমর ভাঙ্গা সৈন্য নিয়ে তুমি নবাবের দাড়িগুলো উপড়ে নেবে। যাদের ভূরি ভূরি অস্ত্র আছে, অগুন্তি সৈন্য আছে, তাদের দেশোদ্ধারের জন্যে মাথা-ব্যথা নেই, আর তুড়িলাফ দিয়ে এগিয়ে এল নিধিরাম সর্দার।

হোসেন। সব দেশেই দু-একটা পাগল এমনি করেই অন্যায়ের গলা টিপে ধরে আদিনা। রাজা উজির আমীর ওমরাহেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন এরাই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে এগিয়ে যায়। এমনি করেই সভ্যতার রথ এগিয়ে চলেছে, গরুর গাড়ীর যুগ শেষ হয়ে জাহাজের যুগের অভ্যুদয় হয়েছে। এসব কথা তুমি বুঝবে না। সোনার বাংলা আজ শ্মশান। আবার আমি তাকে ফলে-ফুলে রূপে-রসে সৌরভে-গৌরবে ভরিয়ে তুলব।

আদিনা। তার আগেই তুমি চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।

হোসেন। মৃত্যুকে আমি ভয় করি না। মরেই ত আছি আমরা, বাঁচতে যদি হয় বাঁচবার মত বাঁচব। কিন্তু তুমি আর এখানে দাঁড়িও না। গোলাগুলি ছুটে আসছে।

আদিনা। আসুক, আমি মরব।

হোসেন। মরায় কোন বাহাদুরি নেই আদিনা। বাঁচার মত বেঁচে থাকতে যে জানে, সেই ত মানুষ। ঘরে যাও আদিনা। আমায় বাধা দিও না। ভয় কি? এত সহজে আমি মরব না। মৃত্যু অনেকবার আমার বুকে তার করাল থাবা বসিয়ে দিয়েছে, তবু আমি মরি নি। আজও আমায় কেউ মারতে পারবে না।

[প্রস্থান।

আদিনা। কার কলিজার মাংস ছিঁড়ে খাব? কার তাজা রক্তে গোসল করব বলতে পার? সোজা মানুষটাকে এমনি করে ক্ষেপিয়ে দিলে? বাবার মাথাটা আমি আস্ত চিবিয়ে খাব।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গৌড় রাজপ্রাসাদের একাংশ।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় বাংলা, জয় সৈয়দ হোসেন শা'র জয়"। অন্দরমহল 'হইতে আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছিল, "খুন, খুন! রক্ষা কর! বাঁচাও, বাঁচাও" ইত্যাদি।]

জুলিয়া বেগম ও লতিফের প্রবেশ।

জুলিয়া। পালিয়ে আয় লতিফ, পালিয়ে আয়। রক্তে ভেসে গেল অন্দরমহল। কেউ বুঝি আর বেঁচে নেই রে। সবাইকে ওরা বুঝি খুন করে ফেললে। যাক—যাক, সব যাক; তুই অন্ততঃ পালিয়ে যা বাবা।

লতিফ। কোথায় পালাব মা? দেখছ না ওরা রাজপ্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে?

জুলিয়া। মসজিদের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যা। ওদিকে হয়ত কেউ নেই।

লতিফ। তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না মা। ওরা তোমায় খুন করবে।

জুলিয়া। করুক। কি মূল্য এ জীবনের? এত দুর্যোগের পরেও আমায় বেঁচে থাকতে হবে? আমি যাব না বাবা, তুই চলে যা।

লতিফ। যেতে হয়, চল দুজনেই চলে যাই।

জুলিয়া। তা হয় না লতিফ। অন্দরমহলে তোর দাদী আছে, আরও একশো পুরনারী আছে। সবাইকে আমি চোরকুঠুরীতে বন্ধ করে এসেছি। নিজের হাতে আমি তাদের বিষ খাইয়ে মারব, তার আগে আমার যাবার উপায় নেই।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় সৈয়দ হোসেন খাঁর জয়।]

জুলিয়া। ওই শোন্ সৈয়দ হোসেন খাঁর জয়। আমাদের সৈন্যরা কি চিরদিনের জন্য নীথর হয়ে গেল?

দ্রুত পুরন্দরের প্রবেশ।

পুরন্দর। এই যে বউবেগমসাহেবা। পুরনারীরা কোথায়?

জুলিয়া। কেন?

পুরন্দর। আমি তাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে এসেছি।

জুলিয়া। কোথায় নিরাপদ স্থান? তোমার নূতন মনিব হোসেন খাঁর শিবিরে? অন্নদাতা প্রতিপালক সুলতানের পুরনারীদের সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দেবার চক্রান্ত করেছ বুঝি পুরন্দর?
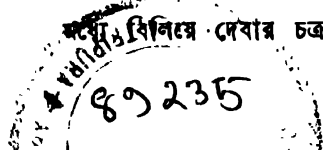
পুরন্দর। আমায় ভুল বুঝবেন না বিবিসাহেবা। দেশের মঙ্গলের জন্যে আমি প্রভুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছি বটে, তাই বলে বিজয়ী সৈন্যদের হাতে তাঁর কুলনারীদের লাঞ্ছনা হক, এও আমি চাই না।

জুলিয়া। তোমার মত রাজদ্রোহী শয়তানের সাহায্যে রক্ষা পাওয়ার চেয়ে তারা জহর খেয়ে মরুক, এই আমি চাই।

পুরন্দর। অভিমানের বশে নিজেদের সর্ব্বনাশ করবেন না বিবি-সাহেবা। যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নবাবী ফৌজ নিঃশেষিত প্রায়। জাঁহাপনার পরাজয়ের আর বিলম্ব নেই। তাই আমি রণস্থল থেকে ছুটে এসেছি রাজপরিবারকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেবার জন্যে। আমায় বিমুখ করবেন না। অবাঙালী সৈন্যরা রাজ-প্রাসাদের দিকে উন্মত্ত হয়ে ছুটে আসছে।

লতিফ। তারা এসেছে।

পুরন্দর। এসেছে।

জুলিয়া। অন্দরমহলে হীরে মুক্তো জহরৎ যা কিছু ছিল সব তারা লুঠ করে নিয়েছে।

লতিফ। ছোট চাচা জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে শুয়েছিল, ওরা তাকে খুন করেছে।

জুলিয়া। জল্লাদগুলো যখন হল্লা করে তার কাছে এগিয়ে গেল, সে তখন বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকছিল। ওরা তাকে টেনে হিঁচড়ে তার গায়ের গহনা খুলে নিলে। আমি চিৎকার করে বললুম, আল্লাতালার দোহাই, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিও না। শয়তানরা হা-হা করে হেসে উঠল। পরমুহূর্ত্তে শাহজাদার কাটা মাথাটা আমার পায়ের উপর এসে ছিটকে পড়ল। উঃ, সেকি দৃশ্য!

পুরন্দর। এ দৃশ্য আমি কয়েক বছর আগে একবার দেখেছিলাম

বেগমসাহেবা। মহম্মদ শা'র বেগমের বুক থেকে তাঁর শিশুপুত্রকে ছিনিয়ে নিয়ে আপনার শ্বশুর মুজাঃফর খাঁ দেওয়ালে আছড়ে মেরেছিলেন, আর তার হাবশী কুত্তাগুলো হা-হা করে হেসে উঠেছিল। এ অনর্থ মুজাঃফর খাঁয়ের নিজেরই সৃষ্টি।

লতিফ। হুঁশিয়ার বেয়াদপ। আমাদের সামনে আমার দাদুসাহেবের নিন্দে করো না।

পুরন্দর। নিন্দা করতে আমারই কি ভাল লাগে শাহজাদা? প্রশংসার যদি কিছু থাকত, তাহলে আজ আমাকে বিপক্ষের জয়ধ্বনি দিতে হত না। কিন্তু আর কথা বলবার সময় নেই। বিবিসাহেবা, বলুন কোথায় পুরনারীরা?

জুলিয়া। যাও—যাও নেমকহারাম। তোমার উদ্দেশ্য কি আমি বুঝিনি মনে করেছ? ওই জল্লাদগুলোর সঙ্গে গিয়ে হাত মেলাও। রাজপরিবারের কে কোথায় অন্ধকারে লুকিয়ে আছে, তাকে টেনে এনে হত্যা কর। ধন-সম্পদ যা কিছু অবশিষ্ট আছে, লুঠ করে নিয়ে যাও। কারও সন্ধান আমি বলব না।

পুরন্দর। তবে আমি যাচ্ছি বেগমসাহেবা। এই পাঞ্জা, নিন। এই পাঞ্জার সাহায্যে যে কোন একজন বেরিয়ে যান, কেউ প্রশ্ন করবে না। কি আর বলব? আমি যতক্ষণ আছি, পুরনারীদের গায়ে কেউ কুশাঙ্কুর বিদ্ধ করতে পারবে না। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।

[প্রস্থান।

জুলিয়া। পাঞ্জা নে লতিফ।

লতিফ। না। যেতে হয়, তুমি যাও। আমি পুরুষ, মরতে জানি।

আহত মজিদের প্রবেশ।

মজিদ। বউবেগম—জুলিয়া—এই যে জুলিয়া।

জুলিয়া। শাহজাদা!

লতিফ। বাপজান!

মজিদ। এখনও বেঁচে আছ লতিফ? পালিয়ে যেতে পারলে না? তোমার চাচা কোথায়?

লতিফ। চাচা নেই বাপজান।

মজিদ। নেই!

জুলিয়া। না শাহজাদা। জ্বরের ঘোরে সে বেহুঁস হয়ে পড়েছিল। শয়তানেরা তার মাথাটা নামিয়ে দিয়েছে। এই দেখ তার রক্ত আমার পায়ে লেগে আছে।

মজিদ। জুলিয়া!

জুলিয়া। কাঁদবার অবসর নেই। তুমি আবার কেন এলে শাহজাদা? চলে যাও; জাঁহাপনার সঙ্গে মিলিত হও।

মজিদ। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে বউবেগম। পিতা নিহত।

জুলিয়া।
লতিফ। } নিহত!

মজিদ। হোসেন খাঁ প্রাসাদ অধিকার করতে আসছে।

জুলিয়া। তবে তুমি কেন এলে? আর যে বেরুবার উপায় নেই। এই পাঞ্জা নাও শাহজাদা, এখনি চলে যাও।

মজিদ। এই পাঞ্জা তুমি কোথায় পেলে?

লতিফ। ওই বেইমান পুরন্দর দিয়ে গেছে।

মজিদ। তবু ভাল যে এতটুকু কৃতজ্ঞতা এখনও অবশিষ্ট আছে। পাঞ্জা নিয়ে তুমি এখনি বেরিয়ে যাও লতিফ।

লতিফ। না বাপজান্ তুমিই চলে যাও। তুমি বেঁচে থাকলে একদিন এর প্রতিশোধ নিতে পারবে।

মজিদ। তোমাদের মৃত্যুর মুখে রেখে আমি পালিয়ে যাব?

জুলিয়া। তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে পিতৃহত্যার বদলা নেবার জন্যে। আমার জন্যে ভেবো না। আমার কাছে ব্রহ্মাস্ত্র লুকোনো আছে। ভাবনা শুধু এই ছেলেটার জন্যে। পুরনারীরা অন্দরমহলে আছে। তাদেরও আমি জহর খাইয়ে মারব। তারপর যা হয় হবে।

মজিদ। তাই কর বউবেগম; আমি আর ভাবতে পাচ্ছি না। আমি তোমার অযোগ্য স্বামী, তোমাকে রক্ষা করতে আমি অক্ষম। মৃত্যু দিয়ে এ অক্ষমতার প্রায়শ্চিত্ত করব। লতিফ, কথা শোন।

লতিফ। তুমি যাও বাবা।

মজিদ। তা হয় না লতিফ। তোমাকে মৃত্যুর কবলে ফেলে রেখে আমি পালাতে পারব না।

লতিফ। আমি মরে গেলে ত পারবে? তাই হোক। তোমার জীবনের দাম আমার চেয়ে অনেক বেশী। [ছুরি বাহির করিয়া নিজের বুকে বিদ্ধ করিল।]

মজিদ। লতিফ! [লতিফের পতনোন্মুখ দেহ বুকে চাপিয়া ধরিল]

জুলিয়া। একি করলি বাপজান? হাণিফ গেছে, তুইও চলে যাবি? ওগো, এ যে রক্তে ভেসে গেল!

মজিদ। আমার জন্যে তুমি আত্মবলি দিলে লতিফ? কেউ আর বেঁচে থাকবে না? সবাই এমনি করেই চলে যাবে? বেঁচে থাকব শুধু আমি, সারাজীবন এই স্মৃতির দাহ সহ্য করতে?

লতিফ। প্রতিশোধ নিও বাবা। আমাদের নুন খেয়ে যারা আমাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে; তাদের কসুর কখনও মাপ করো না। [মৃত্যু]

জুলিয়া। লতিফ!

মজিদ। আর সাড়া দেবে না বউবেগম। কাকে আঁকড়ে ধরেছ? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। ওই অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, মৃতদেহটা আমি অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিয়ে যাচ্ছি। [জুলিয়ার বুক হইতে মৃতদেহ ছিনাইয়া নিল]

জুলিয়া। চোখের জল ফেলো না। যত কান্না আমার জন্তে থাক। তুমি হাসিমুখে চলে যাও। লতিফ, আমার লতিফ, যাও বাবা যাও, রোজ কেয়ামতের দিন আবার দেখা হবে। [মৃতের মুখচুম্বন, মজিদ মৃতদেহ লইয়া চলিয়া গেল।] মেহেরবান মালিক, দেখতে পাচ্ছ তুমি?

গোলাম রসুলের প্রবেশ।

গোলাম। এই যে মহামান্যা বউবেগম। অন্দরমহলের জেনানাদের ত কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় তারা? জবাব দাও।

জুলিয়া। কার কাছে জবাব দেব নফর?

গোলাম। আমার কাছে।

জুলিয়া। কৌন হ্যায় তুম কুত্তীকা বাচ্ছা?

গোলাম। মাথাটা উড়িয়ে দেব শয়তানি।

[গোলাম রসুল তরবারি উত্তোলন করিল, সেই মুহূর্তে হোসেন আসিয়া তরবারির পিঠ দিয়া আঘাত করিলেন। গোলাম রসুলের তরবারি পড়িয়া গেল।]

গোলাম। কোন শয়তান রে?

হোসেন। আমি শয়তান হোসেন শা। চিনতে পাচ্ছ বন্ধু?

গোলাম। জনাব! আপনি! দেখুন, এই হারামজাদী বউবেগম—

হোসেন। ঠিকসে বাৎচিৎ কর। [চপেটাঘাত]

গোলাম। আপনি জানেন না, এই বিবিসাহেবা অন্দরমহলের জেনানাদের কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, কিছুতেই বলবে না।

হোসেন। বলবেনই যদি, তাহলে লুকিয়ে রাখবেন কেন?

গোলাম। আজ্ঞে জনাব,—

হোসেন। গলিত-মাংসলোভী হিংস্র শকুনের দল, রণস্থলের কোন্ প্রান্তে ওঁৎ পেতে বসেছিলে? যুদ্ধের সময় ত তোমাদের মুখ দেখতে পাই নি। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, আর তোমরা কোমর বেঁধে পোড়া ঘরের কাঠ সংগ্রহ করতে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছ। আমি প্রাসাদ অধিকার করবার আগেই তোমরা অন্দরমহলের দখল নিয়ে বসে আছ? ক'জনকে হত্যা করেছ?

জুলিয়া। সংখ্যা নেই। রক্তে লাল হয়ে গেছে অন্দরমহল! ছোট শাহজাদা জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছিল, ওরা তাকেও রেহাই দেয় নি।

হোসেন। ডেকে নিয়ে এস তোমার দোসরদের, আমি তাদের সবাইকে আশাতীত পুরস্কার দেব।

গোলাম। জনাব মেহেরবান। সেলাম—সেলাম।

[প্রস্থান।

হোসেন। আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন বিবিসাহেবা।

জুলিয়া। অভিবাদন! শয়তান নফর, আমাদের অন্নদাস হয়ে তুমি আমাদেরই ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছ। যার অনুগ্রহে পথের

ভিক্ষুক তুমি আজ গৌড়ের দশহাজারী মনসবদার,—তারই কলিজার রক্তে গোসল করে তুমি আমাকে অভিবাদন করতে এসেছ? আমি তোমার অভিবাদনে পয়জার মারি। [হোসেনের গায়ে পাদুকা নিক্ষেপ]

পরাগল খাঁর প্রবেশ।

পরাগল। আমি এ শয়তানির শিরশ্ছেদ করব। [তরবারি নিষ্কাসন]

হোসেন। না পরাগল খাঁ, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিও না।

পরাগল। আপনি বলেন কি? এতবড় হিম্মৎ এই নারীর, যে আপনার গায়ে পাদুকা নিক্ষেপ করে?

হোসেন। করুক না পরাগল খাঁ। আমার হাতে যাঁর আকাশস্পর্শী মান মর্য্যাদা ধুলিধূসরিত,—আমাকে একটু অপমান করে তাঁর অপরিসীম শোক যদি প্রশমিত হয়, করতে দাও অপমান।

পরাগল। জনাব!

জুলিয়া। এত যার ধর্ম্মজ্ঞান, সে তার মনিবের বুকে তরবারি বিঁধিয়ে দিলে কেন হোসেন খাঁ?

হোসেন। বাংলার মঙ্গলের জন্যে বউবেগমসাহেবা। আমি দরিদ্রের সন্তান, সিংহাসন বা রাজৈশ্বর্য্যে আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। জাঁহাপনাও আমার কোন সাধ অপূর্ণ রাখেন নি। কিন্তু বাংলার অফুরন্ত সম্পদ থাকতেও বাঙালীরা থাকবে উপবাসী, আর সব সম্পদ নিয়োজিত হবে কতকগুলো বিদেশী রাজপুরুষের বিলাস ব্যসনে, মানীর মান, নারীর সম্ভ্রম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ দিনের পর দিন বিদলিত হবে এই হাবশী শয়তানদের পায়ের তলায়, এ আমার সহ্য হয় নি বেগমসাহেবা।

পরাগল। আমাদেরও নয়।

হোসেন। দেশব্যাপী যে চাপা আর্ত্তনাদ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, আমি তার মুখে ভাষা দিয়েছিলাম। জঁাহাপনাকে আমি বারবার অনুরোধ করেছিলাম, এই শয়তানির চক্র মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে যথার্থ রাজার মত রাজ্যশাসন করতে। জঁাহাপনা কি জবাব দিয়েছিলেন পরাগল খাঁ?

পরাগল। ঠাকুরের জন্ম হয় ভোগ খেতে, আর কুকুরের জন্ম চাবুক খেতে।

হোসেন। তাঁর কয়েক বছরের রাজত্বে যে কেউ তাঁর কাজের প্রতিবাদ করেছে, তাকেই তিনি নিজের হাতে হত্যা করেছেন; সে আমীর হোক, আর ফকির হোক। একটাই মাত্র গুণ ছিল তাঁর, কি গুণ পরাগল খাঁ?

পরাগল। তাঁর নির্য্যাতনে হিন্দু মুসলমান ভেদ ছিল না।

হোসেন। আমি তাঁকে মারি নি বেগমসাহেবা। মেরেছে তাঁর কর্ম্মফল।

জুলিয়া। হোসেন খাঁ, তোমারই হাতে আজ আমি নিঃস্ব, রিক্ত, সর্ব্বহারা। আমার শোক সন্তপ্ত হৃদয়ের উষ্ণ নিঃশ্বাসে প্রাসাদটা আমি ভরিয়ে রেখে গেলাম। যাবার আগে আমি অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, যেমন করে আমার ছেলে মরেছে, তেমনি করে তোমারও যেন জীবনান্ত হয়।

পরাগল। বিবিসাহেবা,—

হোসেন। আপনার অভিশাপ আমি মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। কিন্তু আপনাকে প্রাসাদ ছেড়ে যেতে ত আমি বলি নি। আমার বোন নেই; আপনার যতদিন ইচ্ছা আমার ভগ্নীর মর্য্যাদা নিয়ে এই প্রাসাদে অবস্থান করুন।

জুলিয়া। তোমার অনুগ্রহ নিয়ে বাস করবে জুলিয়া বেগম? তার চেয়ে বিষ খেয়ে মরা অনেক ভাল। [প্রস্থানোদ্যোগ]

হোসেন। দাঁড়ান বিবিসাহেবা। [জুলিয়া ফিরিলেন, হোসেন তাঁহার পায়ে পাদুকা পরাইয়া দিলেন।] যদি প্রয়োজন হয়, আপনার যে কোন আরজ পূর্ণ করতে এই দীন ভাই প্রস্তুত হয়ে রইল।

জুলিয়া। এ অভিনয়ে জুলিয়া বেগম ভোলে না।

[প্রস্থান।

হোসেন। পরাগল খাঁ, সুলতানের মৃতদেহ সসম্মানে রাজকীয় কবরগাহে পাঠিয়ে দিয়েছ?

পরাগল। হ্যাঁ জনাব!

হোসেন। রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায় তাঁর কবরের ব্যবস্থা কর। আমি তাঁর কবরে প্রথম মাটি দেব। শাহজাদা মজিদ কি বন্দী?

পরাগল। না জনাব। তাকে বন্দী করবার জন্যেই আমি এখানে ছুটে এসেছিলাম। প্রধান তোরণের প্রবেশ পথে এসে দেখলাম, শান্ত্রী প্রহরীদের মাঝখান দিয়ে সে মাথা উঁচু করে বেরিয়ে গেল।

হোসেন। তোমার শৃঙ্খল তোমার হাতেই রয়ে গেল?

পরাগল। উপায় ছিল না জনাব। লোকটার হাতে আপনার পাঞ্জা।

হোসেন। আমার পাঞ্জা? কে দিলে তাকে আমার পাঞ্জা? কে সেই বিশ্বাসঘাতক?

পুরন্দরের প্রবেশ।

পুরন্দর। জনাব,—

হোসেন। কোথা থেকে উত্তেজিত হয়ে এলে? অন্দরমহল

থেকে বুঝি? তোমার কাছে আমার একটা পাঞ্জা ছিল না? পাঞ্জাটি আছে, না হাওয়ায় উড়ে গেছে?

পরাগল। কথা বলছ না যে? কোথায় পাঞ্জা?

পুরন্দর। পাঞ্জা নেই।

পরাগল। হারিয়ে গেছে, না?

পুরন্দর। হারায় নি জনাব। শাহজাদা মজিদ নিজে আহত মরণাপন্ন হয়েও তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে যাবার জন্যে মরিয়া হয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৈন্যরা প্রাসাদ ঘিরে ফেললে। বিপন্ন শাহজাদার প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায় ছিল না।

পরাগল। তাই তোমার কাছে গচ্ছিত সেই মহামূল্য পাঞ্জা তাকে দান করে পুণ্য সঞ্চয় করেছ। তুমি বিশ্বাসঘাতক।

হোসেন। তোমার হাতে এত রক্ত কিসের? এ কোন দুশমনের রক্ত?

পুরন্দর। দুশমনের নয়, এ রক্ত আমাদেরই কয়েকজন সৈনিকের।

হোসেন। আমাদের সৈন্যদের তুমি হত্যা করেছ?

পুরন্দর। হ্যাঁ জনাব। পুরনারীরা সবাই চোরকুঠুরীতে আত্ম-গোপন করেছিলেন। তাঁদের উদ্ধারের জন্যে নদীতে বজরা রেখে আমি অন্দরমহলে ছুটে এসেছিলাম।

হোসেন। বটে!

পুরন্দর। চোরকুঠুরী থেকে ভীত সন্ত্রস্ত পুরনারীদের যখন বাইরে নিয়ে এলাম, এই হিংস্র শ্বাপদের দল তাদের দিকে উন্মত্ত লালসা নিয়ে ছুটে এল জনাব। আমি তখন উপায়ান্তর না দেখে—

হোসেন। তাদের হত্যা করেছ। শুনছ পরাগল খাঁ?

পরাগল। আমি আগেই আপনাকে সাবধান করেছিলাম যে একটা হিন্দুকে এত বিশ্বাস করবেন না। পুরনারীরা কোথায়?

পুরন্দর। আমি তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি।

হোসেন। কোথায় সে নিরাপদ আশ্রয়?

পুরন্দর। তা আমি বলব না।

হোসেন। দেখছ মিঞা, আমার মনসবদার আমাকেই মানতে চায় না।

পরাগল। আপনি ওর মাথাটা নামিয়ে দিন।

হোসেন। তাই দেব পরাগল খাঁ। যে মাথা দলপতির সঙ্গে করে বিশ্বাসঘাতকতা, আর দুশমনের সঙ্গে করে গোপন মিতালি, সে মাথার স্থান দেহের উপরে নয়, আস্তাকুঁড়ের আবর্জ্জনায়।

[তরবারি নিষ্কাসন, পুরন্দর মাথা পাতিয়া দিল।]

আদিনার প্রবেশ।

আদিনা। তাহলে আগে আমার মাথা নাও জনাব।

সকলে। বেগমসাহেবা!

আদিনা। আমিই আদেশ দিয়েছি পানোন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদের খুন করতে। আমিই পুরনারীদের বজরায় তুলে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমার মনসবদারের কোন অপরাধ নেই; সে শুধু আমার হুকুম তামিল করেছে।

হোসেন। আমার বিরুদ্ধাচারণ করতে তোমার এতটুকু দ্বিধা হল না?

আদিনা। না। এমন হুকুম আমি চিরদিনই দেব। তরবারি তোল, আমার মাথাটা কেটে নাও।

পুরন্দর। না জাঁহাপনা, শাস্তি দিতে হয় আমাকে দিন। মমতার এ মন্দাকিনী খেয়ালের বশে শুষে শোষণ করবেন না।

হোসেন। দেখছ পরাগল, এই আমাদের ভাবী বঙ্গেশ্বরী, আর এই আমাদের একজন সেনানায়ক।

পরাগল। বিস্ময়ে আমি অবাক হয়ে গেছি জাঁহাপনা। বেগম-সাহেবা না হয় কোমলপ্রাণা নারী, কিন্তু এই হিন্দু শয়তান—

হোসেন। তুমি ঠিক বলেছ। বেগমকে শাস্তি দিতে হয়, তার পিতাই দেবেন। কিন্তু এই বিদ্রোহী নেমকহারামকে আমি নিজের হাতে দণ্ড দেব।

পুরন্দর। দিন জাঁহাপনা। আমি সে জন্য প্রস্তুত। মাথা নিতে হয় নিন। [নতজানু হইল]

হোসেন। মাথা নিলে ত এক মুহূর্ত্তেই জ্বালা যন্ত্রণার অবসান। তার চেয়ে কঠোর দণ্ড তোমায় দিলাম বিশ্বাসঘাতক। [নিজের কণ্ঠহার পুরন্দরের গলায় পরাইয়া দিলেন।]

সকলে। একি!

হোসেন। দণ্ড। দলপতির রোষ উপেক্ষা করে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত জেনেও আর্ত্তমানবতার জন্যে যে বেইমানি তুমি করেছ, হোসেন খাঁর ভাণ্ডারে তার যোগ্য পুরস্কার নেই। বাংলার আকাশে আজ মসীকৃষ্ণ মেঘের ঘটা। মাটিতে যাদের সোনা ফলে তারা আজ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, তাদের মান-ইজ্জত আজ স্বৈরাচারী রাজশক্তির খেলার সামগ্রী, আর সেই রাজশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে কতগুলো বিদেশী কালপুরুষের হাতে।

পুরন্দর। সত্য জনাব।

হোসেন। আমি এ অন্যায়ের মূলোচ্ছেদ করে আবার ফিরিয়ে

আনব বাঙালীর বাহুতে বল, নয়নে দীপ্তি, বুকে দুর্জ্জয় সাহস, আর ঘরে ঘরে শান্তি। তোমরা আমার সহায় হও বন্ধুগণ। আমি ঐশ্বর্য্য চাই না, রূপ যৌবন চাই না, রাজপরিবারের উপর প্রতিশোধ নিতেও চাই না, চাই শুধু বাংলার শান্তি।

পুরন্দর। জাহাঁপনার জয় হোক।

[প্রস্থান।

পরাগল। এ আপনি কি করলেন জনাব? আমি আপনাকে বুঝে উঠতে পাচ্ছি না জনাব। কি চান আপনি?

হোসেন। চাই বাংলার কল্যাণ। হিন্দু নয়, মুসলমানের নয়, সম্মিলীত হিন্দু-মুসলমানের বৌদ্ধ-ক্রেস্তানের মোটা ভাত, মোটা কাপড় আর নিরাপদ দীর্ঘজীবন—বেগমসাহেবা যে কথা বলছেন না?

আদিনা। আমিও তোমায় বুঝতে পাচ্ছি না। এই দেখছি তুমি বন্যার জলের স্রোতের মত দুর্ব্বার। পরক্ষণেই দেখছি তুমি আকাশের মত উদার। তুমি কটা মানুষ?

হোসেন। একটা বেগম, একটা; তার নাম বঙ্গবন্ধু আলাউদ্দিন হোসেন খাঁ।

[প্রস্থান।

পরাগল। বহিন, একি হল বল ত?

আদিনা। আমিও ত তাই ভাবছি ভাইজান।

পরাগল। যুদ্ধ জয় করে লোকটা কি পাগল হয়ে গেল?

আদিনা। তাই ত দেখছি।

পরাগল। অমন মহামূল্য রত্নহার পরিয়ে দিলে একটা হিন্দুর গলায়—যার যোগ্য শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড?

আদিনা। দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ভাইজান। তুমি আমার মামাত ভাই, এতবড় একটা লড়াই ফতে করেছ, হারছড়া তোমাকে না দিয়ে দিলে কিনা একটা হিন্দুকে! আমি না হয় ওর প্রাণভিক্ষাই চেয়েছিলাম। তাই বলে পুরস্কার! এ পাগলকে তোমরা মসনদে বসিও না ভাইজান।

পরাগল। তা হয় না বহিন। আর কাউকে মসনদে বসাতে কাজীসাহেব রাজী হবেন না।

আদিনা। তাহলে কাজীসাহেবকেই বসিয়ে দাও।

পরাগল। কিছু মনে করো না বহিন। তিনি তোমার পিতা, আমারও পরমাত্মীয়। তবু আমি বলব, তাঁকে মসনদে বসানোর চেয়ে মুজাঃফর শার লাশটাকে বসিয়ে দেওয়া অনেক ভাল।

আদিনা। তাহলে তুমিই কষ্ট করে বসে পড় না।

পরাগল। বহিন, পরাগল খাঁ তরবারি ধরতেই শিখেছে, রাজদণ্ড ধরতে শেখেনি।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে কোলাহল,—"রক্ষা কর, রক্ষা কর।"]

হোসেনের প্রবেশ।

হোসেন। কারা আর্ত্তনাদ করছে? পরাগল খাঁ, পুরন্দর,—এ যে নগরবাসীদের আর্ত্তনাদ। দেখ দেখ, কি বলছে ওরা?

কুতব-উল-আলমের প্রবেশ।

কুতব। কি বলছে জান?

হোসেন। কি বলছে?

কুতব।   গীত।

থামাও রক্তপাত---
আর নিওনা কেড়ে মালিক সর্ব্বহারার মুখের ভাত।
কত নারীর ভাঙ্গল শাঁখা, কাটা গেল কতই শীর,
শ্মশান হল বঙ্গভূমি, এবার অসি নামাও বীর,
ঘুমোক যারা রইল ঘুমে,
কুসুম ফোটাও শ্মশানভূমে,
বুকের ক্ষত জুড়িয়ে দিয়ে লও বাঙালীর প্রণিপাত।

হোসেন। তবু কারা আর্ত্তনাদ করছে হজরত?

কুতব। হোসেন খাঁ তোমার বিজয়ী সৈন্সরা বিজয়োল্লাসে রাজধানী লুণ্ঠন কচ্ছে।

হোসেন। রাজধানী লুণ্ঠন কচ্ছে?

কুতব। এ যদি তুমি বন্ধ করতে না পার, বৃথাই তুমি মুজাঃফর শাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিয়েছ, মসনদে বসবার তোমারও কোন অধিকার নেই। হুঁশিয়ার হোসেন খাঁ।

[প্রস্থান।

হোসেন। আমি এ শাঠ্যের মূলোচ্ছেদ করব। [তরবারি নিষ্কাসন]

আদিনা। আবার কোথায় যাচ্ছ?

হোসেন। শত্রুর রক্তে শ্যামল মাটি রঞ্জিত করেছি, এবার মিত্রের রক্তে স্নান করব।

আদিনা। যেও না। তুমি ক্লান্ত, অবসন্ন; বিশ্রাম কর। আমি পুরন্দরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হোসেন। এরা আমায় বিশ্রাম দেবে না বেগম। বিশ্রাম করব সেদিন, যেদিন বাংলা হবে স্বর্গধাম, মানুষ হবে দেবতা।

[প্রস্থান।

আদিনা। কাণ্ডটা দেখলে? আবার কতগুলো মানুষের মাথা যাবে। যেমন ছোটলোক শ্বশুর, তেমনি ছোটলোক জামাই। দূর, দূর।

[প্রস্থান।

—:•:—

তৃতীয় দৃশ্য।

সুবুদ্ধি রায়ের বাড়ী।

সুবুদ্ধি রায় ও শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। বার—বার তোমাকে আমি বললুম, নবাবকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করো না। তুমি আমার কোন কথাই শুনলে না।

সুবুদ্ধি। কথার মত কথা হলে নিশ্চয়ই শুনতাম।

শঙ্করী। তোমার কথাটাই কথা, আর কারো কথার কোন দাম নেই? পোড়ামুখো নবাব—মুজাঃফর শা বাঁচুক বা মরুক, তাতে তোমার কি? লোকটা দেশটাকে জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে, চোখে দেখতে পাচ্ছ না তুমি?

সুবুদ্ধি। পাচ্ছি।

শঙ্করী। যাকে খুশী খুন কচ্ছে, যাকে খুশী ধরে নিয়ে গিয়ে অপমান কচ্ছে, বুকে পাথর চাপা দিয়ে কারাগারে ফেলে রাখছে, এসব কি মিছে কথা বলতে চাও?

সুবুদ্ধি। সব সত্যি।

শঙ্করী। তবে? হতভাগা নবাব বলে পাঠালে—আমার পালে বাঘ পড়েছে,—তোমরা ছুটে এস, আর অমনি তুমি পাঁচশো সৈন্য পাঠিয়ে দিলে?

সুবুদ্ধি। আমি ত শুধু সৈন্য পাঠিয়েছি। তোমার জামাই সৈন্য-সামন্ত নিয়ে নিজেই যুদ্ধ করতে গেছে। খবর রাখ?

শঙ্করী। বল কি তুমি? বীরবল নিজে গেছে নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করতে?

সুবুদ্ধি। সঙ্গে নিয়ে গেছে দু-হাজার সৈন্য।

শঙ্করী। হতভাগা নবাব মরবে কবে?

সুবুদ্ধি। নবাব বাদশারা মরে না, শুধু ভোল বদলায়, মহম্মদ শা আমাদের সোনার থালায় রাজভোগ খাওয়াত, মুজাঃফর শা আমাদের মুখে অমৃতের বাটি তুলে ধরেছে; তারপর যে আসবে, সে হীরের পালঙ্কে শোয়াবে। এরা সবাই এক, উদ্দেশ্যও একটাই, প্রজাদের রক্ত শোষণ করে দেহ পুষ্ট করা।

শঙ্করী। তবে তোমরা সৈন্য সাহায্য দিলে কেন?

সুবুদ্ধি। তুমি কিছু বোঝ না। নবাব বাদশার অধীনে জায়গীর ভোগ করতে হলে তাদের প্রয়োজনে সৈন্য সাহায্য না দিয়ে উপায় নেই।

শঙ্করী। তুমি বলতে পারলে না আমার সৈন্যদের অসুখ?

সুবুদ্ধি। তাহলে নবাব বলতেন,—তোমার বিবিকে পাঠিয়ে দাও।

শঙ্করী। যুদ্ধটা হচ্ছে কার সঙ্গে?

সুবুদ্ধি। হোসেন খাঁর সঙ্গে।

শঙ্করী। হোসেন খাঁ কে?

সুবুদ্ধি। নবাবের একজন মনসব্দার। লোকটা না কি আগে কোন্ হিন্দুর ক্রীতদাস ছিল।

শঙ্করী। নবাবটাকে সে ঘায়েল করতে পারবে? আমি ত মা-কালীর কাছে জোড়া পাঁঠা আর সন্দেশ মানৎ করেছি।

সুবুদ্ধি। সন্দেশগুলো আমাকে দিলে হয়ত তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হত। মা-কালী কিছুই করতে পারবে না। হোসেন খাঁ বোধ-হয় এতদিনে কবরে গেছে।

সুদর্শন। না পিতা। মুজাঃফর শা নিহত।

সুবুদ্ধি। নিহত!

শঙ্করী। হবে না? এত পাপ কি অমনি যাবে? এত লোকের অভিশাপ কি বৃথা হতে পারে? ও বাবা সুদর্শন, তুমি মলিন মুখে দাঁড়িয়ে আছ কেন? নবাব মরেছে, দেশটা জুড়িয়েছে। তুমি উৎসবের আয়োজন কর। মা-কালীর কাছে আমি মানৎ করেছি। তুমি বাজি বাজনার ব্যবস্থা কর।

সুদর্শন। চুপ করো মা। এ আনন্দোৎসবের সময় নয়। আমাদের পাঁচশো সৈন্যের একজনও জীবিত নেই।

শঙ্করী। এতগুলো সৈন্য সব প্রাণ দিয়েছে?

সুবুদ্ধি। কার কাছে শুনলে তুমি?

সুদর্শন। সৈন্যাধ্যক্ষ ধর্ম্মদাস মাল ক্ষত বিক্ষত দেহে ফিরে এসেছে।

সুবুদ্ধি। কোথায় সে?

সুদর্শন। হোসেন খাঁর অনুচরেরা তার পিছু নিয়েছে। আমি তাকে বজরায় তুলে নবদ্বীপের পথে এগিয়ে দিয়ে এসেছি।

সুবুদ্ধি। এও কি সম্ভব? কোথাকার কে হোসেন খাঁ, যার

জায়গীর নেই, সৈন্য সামন্ত নেই,—তার হাতে নবাব মুজাঃফর শার বিশাল সৈন্যবাহিনী পরাজিত।

সুদর্শন। নবাবের সৈন্যরা ছমাসের বেতন পায়নি। তার উপর তারা পদে পদে অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে ক্ষেপে উঠেছিল। বাংলার কোটি কোটি মানুষ হাবশীদের ক্রীড়নক এই বিলাসী অত্যাচারী নবাবের উচ্ছেদ কামনা করেছিল। মনসবদার হোসেন দেশব্যাপী এই পুঞ্জীভূত অসন্তোষকে কাজে লাগিয়েছে।

সুবুদ্ধি। দুর্ভাগ্য বাংলার যে এক ক্রীতদাস আজ তার ভাগ্য বিধাতা।

সুদর্শন। সাতদিন পরে তার রাজ্যাভিষেক। যদি অনুমতি হয়, আমি তার যোগ্য উপঢৌকন নিয়ে আজই গৌড়ে রওনা হতে পারি।

সুবুদ্ধি। উপঢৌকন দেব একটা ক্রীতদাসকে?

শঙ্করী। তোমার ওই এক রোগ। ক্রীতদাস যেন মানুষ নয়। এমনি গোয়ার্তুমি করেই তুমি আলাউদ্দিনকে তাড়িয়েছ। ছেলেটা দিনরাত পরিশ্রম করত। তবুও কোনদিন তোমার মন পেলনা। এত চাবুক খেয়েও তার মুখ কোনদিন মলিন হত না। মেয়েটাকে কি ভালই সে বাসত।

সুবুদ্ধি। ভালবাসাটা মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছিল কিনা, তাই তাকে বিদায় করে দিতে হল। মুখের উচ্ছিষ্ট সে আমার মেয়ের মুখে তুলে দেবে, এ যদি আমার সহ্য না হয়, সেকি আমার অপরাধ?

শঙ্করী। তাই বলে তুমি তাকে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দেবে?

সুবুদ্ধি। চাবুকটাই তোমরা দেখেছ। যে স্নেহ একটা জড়-পিণ্ডকে পনের বছর ধরে মানুষের আকার দিয়েছিল, তাকে তোমাদের চোখে পড়েনি।

সুদর্শন। পিতা,—

সুবুদ্ধি। না সুদর্শন, বিনা নিমন্ত্রণে আমরা নবাবের দরবারে যাব না। নিমন্ত্রণ যদি আসে, তখন ভেবে দেখা যাবে। তুমি বরং মিহিরপুরে একটা খবর পাঠিয়ে দাও, বীরবল যেন আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে।

সুদর্শন। বীরবল এখনও যুদ্ধ থেকে ফেরে নি।

শঙ্করী। এখনও ফেরে নি? সাতদিন আগে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, তবু সে ঘরমুখো হয় নি? হ্যাঁগো, তুমি যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ? তোমার জামাই বন্দী-টন্দী হয় নি তো?

সুদর্শন। না—না, তা কি হয়? আমি এখনি মিহিরপুর রওনা হচ্ছি। কালই তাকে নিয়ে ফিরে আসব।

বিধবা কুসুমের প্রবেশ।

কুসুম। আর যেতে হবে না দাদা, সব শেষ হয়ে গেছে।

সকলে। কুসুম !!

শঙ্করী। ওরে, এ তুই কোন্ বেশে এসে দাঁড়ালি সর্ব্বনাশি? কবে, কখন কি হয়েছিল, কিছুই ত জানাস নি মা?

কুসুম। জানাবার কিছুই ছিল না মা। হঠাৎ একদিন খবর এল গৌড়ের রাজধানী শত্রুরা আক্রমণ করতে আসছে; সৈন্য সাহায্য চাই। আমার শ্বশুর দুহাজার সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সৈন্যাধ্যক্ষ তখন রোগশয্যায়। মহারাজ সৈন্য চালনার জন্য প্রস্তুত হলেন। যুবরাজ তাঁকে নিরস্ত করে নিজেই সৈন্য পরিচালনা করলেন। দশদিনের যুদ্ধে সৈন্যরা সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, তিনি মাথায় আঘাত পেয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলেন।

সুদর্শন। তারপর?

কুসুম। যখন জ্ঞান হল, তখন দেখলেন তিনি শত্রুর কারাগারে বন্দী।

সুদর্শন। বন্দী!

কুসুম। কারাগারে সাতশো বন্দী সবাই নতজানু হয়ে নূতন নবাবের পদধূলি চুম্বন করে তার জয়ধ্বনি দিলে। তারা সবাই মুক্তি পেয়ে গেল, কিন্তু যুবরাজের উঁচু মাথা নত হল না।

সুবুদ্ধি। হতে পারে না।

কুসুম। তিনি বললেন, এ রসনা শুধু পিতামাতার পদধূলি চুম্বন করতে জানে, আর কারও নয়। সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতির তরবারি তাঁর কাঁধে নেমে এল।

শঙ্করী। উঃ, বুকটা ত তবু ফেটে গেল না। ওগো কি করব আমি বল! কোথায় লুকিয়ে রাখব এ আগুনের গোলা?

সুদর্শন। মা!

সুবুদ্ধি। কেঁদো না রাণি। চোখের জল মুছে ফেল। বীরের মৃত্যু সে বরণ করেছে।

সুদর্শন। পিতা,—

সুবুদ্ধি। নবাব বাদশার পদধূলি চুম্বন করে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল। দেবীকে সন্দেশের ভোগ দেবে না রাণি? দাও—দাও, ভাল করে ভোগ দাও। মুজাঃফর শা গেছে, হোসেন খাঁ আমাদের রক্ষার ভার নিয়েছে। এবার আমরা দলা দলা সোনা খাব। বাংলার মাটিতে স্বর্গ নেমে আসবে। এই তার আরম্ভ।

কুসুম। স্থির হও বাবা।

সুবুদ্ধি। না—না, আমি অস্থির হই নি মা। বাংলাদেশে যখন জন্মেছিস, তখন অনেক সইতে হবে।

শঙ্করী। চল্ মা, ভেতরে চল্। বিধাতার এ দণ্ড আমি ব্যর্থ করব। মুখখানা শুকিয়ে গেছে। আগে কিছু মুখে দিয়ে ঠাণ্ডা হ। তারপর দুজনে মিলে আকাশ ফাটিয়ে আর্ত্তনাদ করব।

কুসুম। আজ আমার নিরম্বু একাদশী মা।

শঙ্করী। আমি মরে গেলে একাদশী করিস। তার আগে নয়। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুদর্শন। পিতা,—

সুবুদ্ধি। কি সুদর্শন, সান্ত্বনা দেবে? তোমার মাকে গিয়ে সান্ত্বনা দাও। রোগে ভুগে যে মরে নি, শত্রুর মুখে অবজ্ঞার নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে যে মাথা উঁচু করে মরেছে, তার জন্যে সুবুদ্ধি রায় কাঁদে না। আমি শুধু ভাবছি কি নিকৃষ্ট এই হোসেন খাঁ। আমি ওকে কিছুতেই ক্ষমা করব না।

সুদর্শন। কিন্তু আপনি আর এখানে অপেক্ষা করবেন না পিতা। কারা যেন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।

সুবুদ্ধি। আসুক। তুমি দেওয়ানজিকে খবর দাও।

সুদর্শন। যাচ্ছি পিতা।

[প্রস্থান।

সুবুদ্ধি। কে?

আফজলের প্রবেশ।

আফজল। আদাব রায়জি। মেজাজ শরীফ?

সুবুদ্ধি। আফজল খাঁ নয়?

আফজল। জী।

সুবুদ্ধি। গৌড়ের প্রধান নগরপাল আমার গরীবখানায়, আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করুন।

আফজল। আগমনের উদ্দেশ্য আপনি জানেন না?

সুবুদ্ধি। না।

আফজল। না? আপনার সৈন্যরা জনাব হোসেন খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, সে কথা আপনার মনে নেই?

সুবুদ্ধি। আছে।

আফজল। চলুন। নবাবসাহেব আপনাকে তলব দিয়েছেন।

সুবুদ্ধি। তলবের প্রয়োজন নেই। নিজের প্রয়োজনেই আমি যাব। শিবিকা নিয়ে এস।

আফজল। শিবিকা! আসামীর আবার শিবিকা চাই! পায়ে হেঁটে যদি যেতে না পার, ঘোড়ায় চড়ে চলে এস। আগে পিছে পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ার থাকবে।

সুবুদ্ধি। এই কি তোমাদের সেই ভুঁইফোঁড় নবাবের হুকুম?

আফজল। হুঁশিয়ার বেয়াদপ। নবাবসাহেবের নামে কোন কটূক্তি করলে আমি তোমার মাথাটা নামিয়ে দেব।

সুবুদ্ধি। সেদিনও তোমায় নবাব মুজাঃফর শার পদলেহন করতে দেখেছি আফজল খাঁ। তাঁরই অনুগ্রহে তুমি ছিলে মহালদার, হয়েছ নগরপাল। আজ হোসেন খাঁ বুঝি দুখানা বেশী রুটি ছুঁড়ে দিয়েছে? তাই মনিবের মরার সঙ্গে সঙ্গে ভোল পালটে নিয়েছ।

আফজল। [স্বপদদাপে] তুমি যাবে কিনা আমি জানতে চাই।

সুবুদ্ধি। যাব আফজল খাঁ। যে নিকৃষ্ট জল্লাদ বিনা অপরাধে আমার জামাতার শিরশ্ছেদ করেছে, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি কৈফিয়ৎ চাইব। কিসের জন্য তার এই নৃশংসতা? সে যদি মনে

করে থাকে যে হুদশজন জায়গীরদারের মাথা নামিয়ে দিলেই গোটা বাংলাদেশ এই ভূতপূর্ব্ব ক্রীতদাসের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে, তাহলে সে নির্ব্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, উন্মাদ।

আফজল। হুঁশিয়ার কমবক্ত্।

[তরবারি তুলিল, সুবুদ্ধি রায়ের তরবারি তাহা প্রতিরোধ করিল। উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।]

—:o:—

চতুর্থ দৃশ্য।

দরবার কক্ষ।

চাঁদ কাজী, পরাগল খাঁ ও পুরন্দরের প্রবেশ।

পুরন্দর। সুলতান কখন দরবারে আসবেন কাজীসাহেব?

চাঁদ কাজী। যখন তার মর্জ্জি হবে।

পুরন্দর। এত দেরী কচ্ছেন কেন? তিনি কি শোনেন নি যে আমীর ওমরাহ, রাজা-প্রজা সবাই আজ তাঁকে সেলাম জানাতে রাজধানীতে সমবেত হয়েছে? বাইরের প্রাঙ্গণে লক্ষ লক্ষ প্রজা জমায়েৎ হয়েছে নূতন নবাবকে দর্শনের জন্তে। অথচ তাঁর দেখা নেই। একবার দেখে এলে হত না কাজীসাহেব?

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি ও জয়নাদ—"জয় বঙ্গেশ্বর আলাউদ্দিন হোসেন শার জয়"।]

হোসেন জনতার উদ্দেশ্যে হাত তুলিয়া প্রত্যাভিবাদন করিতে করিতে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

হোসেন। এই দরবার কক্ষ! আগে ত ভাল করে দেখি নি। এত সোনা এর সর্ব্বাঙ্গে মুড়ে দিয়েছে। মিনারে মিনারে মণিমুক্তো মাণিক্যের ঘটা। মাথার উপরে সোনার পাতের বিরাট আচ্ছাদন। দুনিয়ার সব ঐশ্বর্য্য কি জমা হয়েছে এই দীনদরিদ্র বাংলার রাজ-সভায় জনাব?

চাঁদ কাজী। অবাক হয়ে চেয়ে রইলে কেন বাপজান? এই বাদশাহী রীতি। চিরদিন এই রীতিই চলে আসছে।

হোসেন। আর তা চলবে না জনাব। প্রজারা থাকবে উপবাসী; তাদের পরিধানে কটিবস্ত্র জুটবে না, আর সুলতানের দরবার কক্ষে সোনা, মুক্তো, মণি-মাণিক্য ঝলমল করবে, তার বাগিচায় হামামে আর অন্দরমহলে সুগন্ধি জলের ফোয়ারা ছুটবে, এ অনিয়মের এই-খানেই অবসান হোক।

চাঁদ কাজী। হোসেন শাহ!

হোসেন। বন্ধ করে দিন এ দরবার-কক্ষ। কাল থেকে দরবার বসবে নবাবের বিশাল হাওয়াখানায়।

পরাগল। সে যে এক জীর্ণ পুরণো কক্ষ জনাব।

হোসেন। রামায়ণ পড়েছ পরাগল খাঁ? রামের পাদুকা সিংহাসনে বসিয়ে হর্ম্ম্যতলে বসে ভরত দরবার করত। বাদশা নাসিরুদ্দিনের কথা জান? তাঁর বেগম একটা বাবুর্চি রাখতে চেয়েছিলেন। বাদশা তার কি উত্তর দিয়েছিলেন পুরন্দর?

পুরন্দর। উত্তর দিয়েছিলেন,—রাজকোষের অর্থ প্রজাদের, আমার নয়। বাবুর্চির খরচ জোগাবার সাধ্য আমার নেই।

হোসেন। দুঃখিত হবেন না জনাব। আবার আমরা এই দরবার-কক্ষে বসব, যেদিন বাংলাদেশের কারও অশন-বসনের অভাব থাকবে না।

চাঁদ কাজী। আমি বলতে চাই,—

হোসেন। পরে বলবেন। খাজাঞ্চিকে আমি বলেছি রাজকোষ উন্মুক্ত করে রাজকর্ম্মচারীদের বেতন মিটিয়ে দিতে। দেখে আসুন আমার হুকুম তিনি তামিল করেছেন কিনা।

পরাগল। আমরা সবাই বেতন পেয়েছি জাঁহাপনা।

চাঁদ কাজী। রাজকোষে এত অর্থ এল কোথা থেকে?

হোসেন। বারোশো সৈন্য নগর লুণ্ঠন করে যত অর্থ আত্মসাৎ করেছিল, এই হস্তিমূর্খ হিন্দু মনসবদার সে সব অর্থ কেড়ে নিয়ে রাজকোষে জমা করে দিয়েছে।

চাঁদ কাজী। আর তুমি সে সৈন্যদের কি করেছ?

হোসেন। কি করেছি পরাগল খাঁ?

পরাগল। সবাইকে হত্যা করেছেন।

চাঁদ কাজী। ছি-ছি, এ তুমি করেছ কি হোসেন? বিজয়ের পর সৈন্যরা লুঠতরাজ করেই থাকে। নবাব বাদশার এ চিরদিনের প্রথা।

হোসেন। তা আমি কি করব? এই হিন্দু মনসবদার আমায় বোঝালে যে অন্যায় চিরদিনই দণ্ডনীয়, অধর্ম্মের বয়স বাড়লেই সে ধর্ম্ম হয়ে যায় না।

চাঁদ কাজী। হিন্দু মনসবদার বললে, আর তুমি তাই চোখ বুঁজে মেনে নিলে? সে তোমার মনসবদার, না তুমি তার মনসব-দার? যে সৈন্যেরা তোমার মাথায় বিজয়-মুকুট পরিয়ে দিয়েছে, তুমি রাজরশ্মি হাতে নিয়ে তাদেরই কাঁধের উপর তরবারি তুললে?

পুরন্দর। ওরা লুঠ করতেই এসেছিল কাজীসাহেব, যুদ্ধ কেউ করে নি।

হোসেন। যে হৃত সর্ব্বস্ব দেশবাসীর দুঃখ মোচনের জন্য আমরা নবাব মুজাঃফর শার হাত থেকে রাজ্যরশ্মি ছিনিয়ে নিয়েছি, আমার অনুগামীরা যদি তাদেরই মুখের ভাত কেড়ে নেয়, তাদেরই ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পৈশাচিক আনন্দে নৃত্য করে, তবে কেন আমরা নেমেছি জনাব এই রক্তের হোলি খেলায়? কুমীরের কবল থেকে আমার অভাগা দেশবাসীকে ছিনিয়ে এনেছি কি বাঘের মুখে তুলে দেবার জন্য?

চাঁদ কাজী। হোসেন,—

হোসেন। তা নয়। এ ক্ষয়িষ্ণু জাতির মৃতকল্প দেহে আমি জীবনের জোয়ার নিয়ে আসব। যে আমার পথে বাধা দেবে, আমি তাকে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যাব,—সে আমীর হক, আর ফকির হক।

পুরন্দর। মহানুভব বঙ্গেশ্বর, আপনার এই দুর্গম যাত্রাপথে আর কেউ যদি আপনার সঙ্গী নাও হয়, এই বান্দা কখনও আপনাকে ত্যাগ করবে না। [প্রস্থান।

হোসেন। পরাগল খাঁ মুখ ফিরিয়ে যে?

পরাগল। মাপ করবেন জাঁহাপনা। হিন্দু মনসবদারের এই আধিপত্য আমার,—

হোসেন। পছন্দ হচ্ছে না। সংসারে সব কিছুই সবার পছন্দ হয় না, তবু সইতে হয় মিঞা। কি দেখছেন জনাব?

চাঁদ কাজী। দেখছি হাবশী আমীর ওমারাহেরা কেউ ত তোমাকে সেলাম জানাতে এল না।

হোসেন। আসবে না।

চাঁদ কাজী। কারণ?

হোসেন। তাঁরা গোঁসা করেছেন।

আলি আব্বাসের প্রবেশ।

আলি। এর অর্থ কি জাঁহাপনা?

হোসেন। কিসের অর্থ আলি আব্বাস?

আলি। আমরা কি পদচ্যুত?

হোসেন। আমরা,—?

আলি। আমরা হাবশী, আমীর, উজির, সিপাহশালার?

হোসেন। সে কি কথা? আপনারা সব মাননীয় ব্যক্তি। দশ-বছর ধরে গৌড়বঙ্গের রাজ্যসভা অলংকৃত করে বসে আছেন। নবাবের আড়ালে বসে আপনারাই ত দেশটা শাসন করেছেন, আপনাদের কি আমি পদচ্যুত করতে পারি?

আলি। তবে দরবারে আমাদের ডাক পড়েনি কেন?

হোসেন। দশ বছর অনেক মেহনত করেছেন আপনারা। তাই আপনাদের কাজ আমি হাল্কা করে দিয়েছি। যাঁরা আমীর, উজীর, ওমরাহ ছিলেন, তারা ইচ্ছে করলে মনসবদারী করতে পারেন। আর যারা আজ দো-হাজারী পাঁচ-হাজারী মনসবদার,—তারা হবেন মীরমুন্সী, হিসাব-নবীশ, থানাদার।

চাঁদ কাজী। তাহলে আমীর, উজির হবে কারা?

হোসেন। বাংলাদেশে প্রতিভার অভাব নেই। এখানে রূপ-সনাতনের মত কুশাগ্রবুদ্ধি পণ্ডিত আছে, বিজয় গুপ্তের মত কবি আছে, আরও আছে চাঁদ কাজী, পরাগল খাঁ, পুরন্দরের মত অমিত

শক্তিধর হিন্দু-মুসলমান। আপনারা বিদেশ থেকে এসেছেন, আমাদের দুশ্চিন্তার গুরুভার আর আপনাদের মাথায় চাপিয়ে দেব না।

আলি। ভেতো বাঙালীর হাতে সেনাবাহিনীর ভার তুলে দিলে কি বাংলার মঙ্গল হবে ভেবেছেন?

হোসেন। বিশ না হয় উনিশ ত হবে? তাই ভাল আলি আব্বাস। তবু বাংলার দুধের সর সবার আগে বাঙালীরাই ভোগ করবে। আর ভিনদেশীরা পাবে তাদের ভুক্তাবশেষ। তাই না পরাগল খাঁ?

পরাগল। জী হাঁ। তবে—

আলি। এ মতলব আপনি ত্যাগ করুন জাঁহাপনা, এর ফল কখনও ভাল হবে না।

হোসেন। ভাল অনেক করেছ আলি আব্বাস। বাংলার চিন্তায় তোমাদের চোখে ঘুম ছিল না। এবার গায়ের ঘাম মুছে ফেলে বিশ্রাম করগে!

আলি। আপনি আমাদের বে-ইজ্জৎ করছেন। আমরা পাঁচশো হাবশী নিষ্ক্রিয় হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম বলেই আপনি এত সহজে জয়ী হয়েছেন। আপনি মসনদে বসেই আমাদের উৎখাত করতে চান।

চাঁদ কাজী। তুমি উত্তেজিত হয়েছ আলি আব্বাস।

পরাগল। চোখ রাঙিয়ে লাভ নেই মিঞা। জাঁহাপনা যা বলেছেন, তাই কর। নূতন নকরী গ্রহণ কর।

আলি। থামো। ভেতো বাঙালীর উপদেশ আমি শুনতে চাই না।

চাঁদ কাজী। আলি আব্বাস!

হোসেন। আমীরসাহেব ভুলে গেছেন যে, হোসেন খাঁ নিজেও ভেতো বাঙালী। কোন যুগে আমার পিতামহ আরবের কোন পল্লীতে জন্মেছিলেন, আমি সে পল্লী কোনদিন দেখি নি। আমি জন্মেছি এই বাঙলায়। বাঙলা আমার দেশজননী। ভেতো বাঙালীই আমার পরিচয়।

আলি। তাহলে আমি আর সিপাহশালার নই?

হোসেন। না। সিপাহশালার এই পরাগল খাঁ, আর তার সহকারী পুরন্দর। তুমি আজ থেকে দু-হাজারী মনসবদার।

[পরাগল খাঁ কুর্নিশ করিল।]

আলি। সিপাহশালার থেকে দো-হাজারী মনসবদার।

চাঁদ কাজী। বুঝে কাজ কর হোসেন শা।

হোসেন। তাই ত কচ্ছি জনাব। আপনি দেখেন নি, সাতশো বন্দীকে যখন আমার কাছে নিয়ে আসা হল, পরাগল খাঁর হুকুমে সবাই আমায় আভূমি-নত হয়ে কুর্নিশ করলে। মিহিরপুরের যুবরাজ বীরবল বললে,—পিতামাতা ছাড়া কারও পদধূলি আমি চুম্বন করতে জানি না। বিস্ময়ে মুগ্ধ আমি, যে মুহূর্ত্তে তার মুক্তির আদেশ দিতে উদ্যত হলাম, সেই মুহূর্ত্তে আমার অতি উৎসাহী সিপাহশালারের তরবারির আঘাতে সেই বীর যুবকের মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আলি। জাঁহাপনার অপমান আমি বরদাস্ত্ করি নি, এই কি আমার কসুর?

পরাগল। অপমান তুমিই বেশী করেছ মিঞা।

আলি। হুঁশিয়ার বাঙালি।

হোসেন। কথায় কথায় সুলতানের সামনে যে তরবারি তোলে, তাকে কি বলে পরাগল খাঁ?

পরাগল। বেয়াদব।

হোসেন। এ বেয়াদবি যদি এর পরেও আমি দেখতে পাই, তাহলে দো-হাজারি মনসবদার এরপর হবেন মহামান্য চৌকিদার।

আলি। বেশ, দেখা যাক্ কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে মরে। সেলাম। [প্রস্থানোদ্যোগ]

হোসেন। দাঁড়াও আলি আব্বাস। দিল্লীর সম্রাট সেকেন্দার শাকে গৌড়বঙ্গ আক্রমণ করতে কারা আমন্ত্রণ করেছে বলতে পার?

চাঁদ কাজী। সে কি!

আলি। আমি এসব কিছুই জানি না।

হোসেন। ত্রিপুরার রাজা তোমাদের আমন্ত্রণে বাংলার দিকে ছুটে আসছে না?

পরাগল। বলেন কি জনাব?

আলি। কার কাছে আপনি কি শুনেছেন?

হোসেন। যা শুনেছি, তা যদি সত্য হয়, তাহলে রাজদ্রোহী শয়তানদের আমি আকণ্ঠ প্রোথিত করে গোখরো সাপ দিয়ে দংশন করাব।

আলি। আপনার যেরূপ মর্জি হয় করবেন। আমি শুধু বলতে চাই যে আমরা এর বিন্দুবিসর্গ জানি না।

[প্রস্থান।

চাঁদ কাজী। তুমি যে ভাবিয়ে তুললে হোসেন।

পরাগল। এ সব সত্য?

হোসেন। সত্য। মসারক খাঁকে সসৈন্যে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে দাও। মহারাজের যুদ্ধপিপাসা চিরদিনের জন্য মিটিয়ে দেওয়া চাই।

পরাগল। জাঁহাপনার আদেশ শিরোধার্য্য। [প্রস্থান।

চাঁদ কাজী। তাই ত হোসেন, এ যে আমি ভাবতেই পারি নি। এখন উপায়?

হোসেন। মহামান্য সম্রাটের জন্য আমি বিশলক্ষ টাকা, পঞ্চাশটি হাতী আর প্রচুর সোনাদানা সংগ্রহ করে রেখেছি। আপনি আজই এই সওগাত নিয়ে যাত্রা করুন।

চাঁদ কাজী। বিশলক্ষ টাকা তুমি পেলে কোথায়?

হোসেন। মুজাঃফর শা'র গুপ্ত ধনাগারে টাকার পাহাড় সঞ্চিত আছে, অথচ প্রজারা দুর্ভিক্ষে আর মহামারিতে গরু-ছাগলের মত প্রাণ দিয়েছে। বাকি অর্থ দিয়ে আমি হাজার হাজার বিদ্যালয় গড়ে তুলব। সে বিদ্যালয় শুধু কাব্যসাহিত্যের চর্চ্চা করবে না, খাঁটি মানুষ গড়ে তুলবে। যারা শুধু জ্ঞানে গরীয়ান হবে না, চরিত্রে হবে শুকদেব, সঙ্কল্পে হবে ভীষ্ম, আর বীরত্বে হবে সোরাব-রুস্তম।

চাঁদ কাজী। হোসেন,—

হোসেন। আবার বাংলা সোনার বাংলা হবে। অকালে কেউ মরবে না, বিদেশীর ভ্রূকুটি কেউ গ্রাহ্য করবে না, ধর্ম্মের জন্য হানা-হানি করে এ জাত আর এমনি করে ক্ষয় হয়ে যাবে না। আমি যেদিন থাকব না, সেদিনও বিদেশী পর্য্যটকেরা এসে সৌন্দর্য্যের খনি এই পবিত্র তপোবন দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে বলবে,—'এই হোসেন শা'র বাংলাদেশ'।

চাঁদ কাজী। খোদাতালা তোমায় দোয়া করুন বাপজান। কিন্তু হাবশীদের এমনি করে তুমি ক্ষেপিও না। হাজার হাজার হাবশী যদি বিদ্রোহ করে, বাঙলার মাটিতে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। হুঁশিয়ার হোসেন শা, হুঁশিয়ার। [প্রস্থান।

হোসেন। অন্যায় বলে যা বুঝেছি, তার সঙ্গে আপোষ আমি করব না।

আফজল খাঁর প্রবেশ।

আফজল। বন্দেগি জাঁহাপনা। মুজাঃফর খাঁ,—

হোসেন। নবাব মুজাঃফর শা।

আফজল। নবাব মুজাঃফর শাকে যে শয়তান জায়গীরদারেরা,—

হোসেন। বিশেষণ থাক মিঞা। কি করেছেন জায়গীরদারেরা তাই বল।

আফজল। যে জায়গীরদারেরা নবাবকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল, আমি তাদের সবাইকে বেঁধে এনেছি।

হোসেন। কার হুকুমে?

আফজল। সিপাহশালারের হুকুমে। আপনি তাদের দণ্ড দিন। তারা নবাবকে সাহায্য করে কোন বিবেচনায়?

হোসেন। জায়গীর ভোগ করলে নবাবের প্রয়োজনে সৈন্য সাহায্য দিতে হয়, তা বুঝি তোমরা জান না?

আফজল। তারা সব দুশমন। এখনও তারা আপনাকে কটূক্তি কচ্ছে।

হোসেন। করবেই ত। সবাই ত তোমার মত প্রভুভক্তি এত সহজে ঝেড়ে ফেলতে পারে না।

আফজল। আপনি কি বলছেন জাঁহাপনা? মহম্মদ শা'কে যারা সাহায্য করেছিল, পরবর্ত্তী নবাব মসনদে বসে তাদের সবাইকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন।

হোসেন। তারা ছিলেন নবাবের ব্যাটা নবাব। আমি দীন

দরিদ্রের সন্তান; আজ হয়েছি আমীর, কাল হব ফকির। তাঁদের পথ আর আমার পথ এক নয় মিঞা।

আফজল। আপনি জানেন না, হিন্দু জায়গীরদারেরা আপনার নামে কি কুৎসা রটনা করেছে। বিশেষ করে ওই কসবীর বাচ্চা সুবুদ্ধি রায়—

হোসেন। খবরদার, মু-সাদ্দালকে বাৎচিৎ করো। কোথায় রাজা সুবুদ্ধি রায়? কোথায় তিনি?

শৃঙ্খলিত সুবুদ্ধি রায়ের প্রবেশ।

সুবুদ্ধি। সুবুদ্ধি রায় তোমার সম্মুখে জল্লাদ।

হোসেন। বাঁধন খুলে দাও।

আফজল। জাঁহাপনা!

হোসেন। হুকুম তামিল কর বেয়াদপ।

[আফজল খাঁ সুবুদ্ধি রায়ের বাঁধন খুলিল।]

সুবুদ্ধি। চমৎকার অভিনয়। এত যার দয়া, সে বিনা অপরাধে বীরবলের মাথাটা নামিয়ে দিয়েছিল কেন? কি করেছিল সে বীর যুবক? মানুষ নামধারী জানোয়ারগুলোর মত সে তোমার পদলেহন করে নি, এর জন্যে তার প্রাণদণ্ড দিয়েছ তুমি? শ্রদ্ধায় তোমার মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ত, যদি তোমার গায়ে মানুষের চামড়া থাকত।

আফজল। হুঁশিয়ার শয়তান। [তরবারি নিষ্কাসন]

হোসেন। [হাত তুলিয়া তাকে নিরস্ত করিলেন] বলুন মহারাজ, এখন আপনি কি করতে চান।

সুবুদ্ধি। আমি প্রাণ গেলেও তোমার বশ্যতা স্বীকার করব না।

আফজল। করবে না?

সুবুদ্ধি। না।

হোসেন। বশ্যতা স্বীকার না করেন, আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।

সুবুদ্ধি। আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, আমার একমাত্র জামাতাকে তুমি যে অপঘাত মৃত্যু দিয়েছ, তেমনি অপঘাত মৃত্যু যেন তোমারও পরিণাম হয়।

হোসেন। কে আপনার জামাতা? বীরবল! ওঃ—

আফজল। কি হল জনাব?

হোসেন। না—না, কিছু হয় নি। জায়গীরদারদের নিয়ে এস। আমি ভেবে দেখি কি শাস্তি তাদের যোগ্য।

আফজল। এখনি যাচ্ছি জাঁহাপনা। আর সবাইকে লঘু শাস্তি দিতে চান দিন। কিন্তু এই লোকটা আমার গায়ে থুৎকার দিয়েছে, আমার বিশজন অনুচরকে খতম করেছে। এই শয়তানের বাচ্ছাকে শূলে বসিয়ে দিন।　　　　　　　　　　　　　　　　[প্রস্থান।

হোসেন। রাজা,—

সুবুদ্ধি। সম্বোধন থাক হোসেন খাঁ। মুক্তির জন্যে আমি লালায়িত নই। আমার পুত্রাধিক প্রিয় জামাতাকে যেখানে পাঠিয়েছ, আমাকেও সেইখানে পাঠিয়ে দাও। জেনে রাখ, আমি কিছুতেই তোমাকে নবাব বলে স্বীকার করব না।

হোসেন। নাই বা স্বীকার করলেন। আমায় আপনি দোয়া করুন। [নতজানু হইলেন] আপনার জামাতাকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারব না। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, তাকে আমি হত্যা করি নি, করেছে আমার নসীব। বিশ্বাস করুন, আপনার কন্যার বৈধব্যের জন্যে আপনারই মত আমারও বুকটা ফেটে যাচ্ছে বাবা-ঠাকুর। [মাথার উষ্ণীষ খুলিয়া ফেলিলেন]

সুবুদ্ধি। তুমি কে? কে তুমি? তাই ত, এ কার চোখ? কার এ শালপ্রাংশু সুগঠিত দেহ? এ কণ্ঠস্বর কার? তুমি,—

হোসেন। আমি আপনার ক্রীতদাস আলাউদ্দিন।

সুবুদ্ধি। আলাউদ্দিন! আমার সেই অপোগণ্ড হস্তিমূর্খ ক্রীতদাস আজ বাংলার ভাগ্যবিধাতা! না—না, তা কি করে হবে? তুমি রহস্য কচ্ছ।

হোসেন। রহস্য নয়। পিঠে হাত দিয়ে দেখুন, আপনার চাবুকের দাগ এখনও সব মিলিয়ে যায় নি। চাবুকটাও আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি বাবাঠাকুর। এই চাবুকের ঘা আমার চোখে পৃথিবীর অফুরন্ত আলোর দোর খুলে দিয়েছে। আমি যেদিন কবরে যাব, সেদিন আমার সঙ্গে আর কিছুই যাবে না, যাবে শুধু এই চাবুক।

সুবুদ্ধি। দেশের দুর্ভাগ্য যে পনের বছর যে গরু চরিয়েছে, লাঙ্গল চালিয়েছে, ঘাস কেটেছে, সে আজ পাঁচকোটি মানুষের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক। সবাই তোমায় আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করলেও আমি কখনও করব না।

হোসেন। সে কি কথা বাবাঠাকুর? আপনি আমায় কুর্নিশ করবেন কেন? আমি পাঁচকোটি বাঙালীর শাহানশা, কিন্তু আপনার পয়জারের নফর। কুর্নিশ করব আমি; সেদিনও করেছি, আজও করব,—আদাব—আদাব।

[কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান।

সুবুদ্ধি। না—না, এ হতে পারে না। পিঠে যার দিনে দশবার পদাঘাত করেছি, তাকে আমি নবাব বলে স্বীকার করব না। দেখ না আমি রাজকর, দেখি কে আমার মাথাটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দেয়। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

মজিদের বাসভবন।

গোলাম রসুল ও তালপাত সিংয়ের প্রবেশ।

তালপাত। ওহে গোলাম, ওহে গোলাম,--

গোলাম। কি তুমি গোলাম গোলাম কচ্ছ? গোলাম রসুল বলতে পার না?

তালপাত। পারি, তবে অত কথা বলবার সময় কি আর আছে মিঞা? দেখছ না, নবাবের মেজাজ? লোকটা নিজেও বিশ্রাম করে না, আমাদেরও বিশ্রাম করতে দেয় না। রাত দুপুরে ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ দরোজায় দড়াম দড়াম করে ঘা পড়ল। দরোজা খুলে দেখি নবাবসাহেব দাঁড়িয়ে। কি সমাচার? না, ছোট পাণ্ডুয়ায়।

গোলাম। কেন?

তালপাত। আর কেন? কোন্ ভিখিরীর ঘর কোন্ অ-বাঙালী মুসলমান নাকি ভেঙ্গে দিয়েছে, থানাদারকে গিয়ে বল তাকে গলায় কলসী বেঁধে ডুবিয়ে মারতে।

গোলাম। হুঁ!

তালপাত। তুমি ত হুঁ বলে খালাশ। আমার অবস্থাটা ভাব দেখি। পাণ্ডুয়া থেকে যাঁহাতক এসে দাঁড়িয়েছি, অমনি হুকুম হল যাও চট্টগ্রামে। কোন্ ঘুঁটে কুড়ুনীর মেয়েকে কোন্ মনসবদার

নাকি বে-ইজ্জৎ করেছে, তার মাথাটা পাঠিয়ে দিতে বল। এ রকম মেজাজী নবাব ত আর কখনও দেখি নি গোলাম।

গোলাম। গোলাম রসুল বল।

তালপাত। কি রকম নবাব বল ত? লোকটা মদ মাংস ছোঁবে না, মেয়েমানুষের দিকে ফিরেও তাকায় না। বললে বিশ্বাস করবে না, লোকটা নমাজ পড়ে কিনা জানিনে, কিন্তু পুজোর প্রসাদ খায়।

গোলাম। জাহান্নামে যাবে।

তালপাত। আর কবে যাবে? তোমরা দিল্লীর বাদশাকে ডেকে আনলে, তাকে এমন ভেট দিলে যে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। ত্রিপুরার রাজা তোমাদের উস্কানি পেয়ে বাঙলা আক্রমণ করবার আয়োজন কচ্ছিল, পুরন্দর চিরদিনের জন্যে তার খোয়াব ছুটিয়ে দিয়ে এসেছে। নবাব হোসেন শার নামে এখন বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।

গোলাম। তোমার যে মুখে খুশী ধরে না তালপাত সিং।

তালপাত। কি ছাই বলছ? আমরা অ-বাঙালীরা বাঙালীদের মানুষ করেছি, আর আমরাই কি না আজ নবাবের চক্ষুশূল? এ কি অন্যায় নয় গোলাম?

গোলাম। ফের গোলাম?

তালপাত। চিরদিনই আমরা বাঙালীদের বুকে মই দিয়েছি, বাঙলার মেয়েদের নিয়ে ফষ্টি-নষ্টি করেছি, বাঙালীদের বিত্তি-ব্যাসাৎ কেড়ে খেয়েছি। কেউ ত কোন কথা বলে নি। আর আজ তার জন্যে কঠোর শাস্তি পেতে হয়? ধর্ম্ম কি রসাতলে গেল গোলাম?

গোলাম। তুমি বড় বেয়াদপ আদমি।

তালপাত। তোমার মত একটা মানীলোককে নবাব কিনা বেঁধে জুতোপেটা করলে।

গোলাম। কবে জুতোপেটা করেছে?

তালপাত। সেই যে যেবার যুদ্ধ জয় করে তুমি দলবল নিয়ে বেগমমহলে রসিকতা করতে গিয়েছিলে। তোমার সঙ্গীদের হাত কেটে দিয়েছে, দিক; তাই বলে তোমাকে জুতোপেটা করবে?

গোলাম। আরে যাও যাও, মিথ্যুক কোথাকার?

তালপাত। নবাবসাহেব বাঙলাদেশে অ-বাঙালীদের চিহ্নও রাখবে না। তোমাদের করবে জবাই, আমাদের দেবে বলি।

গোলাম। তোমাকে বলি দেবে কেন? তুমি ত তার পা-চাটা কুকুর।

তালপাত। ধাপ্পা মিঞা, সব ধাপ্পা। আমি তার তাঁবেদারি কচ্ছি কেন জান? প্রতিশোধ নেবার জন্যে। বুঝলে না গোলাম?

গোলাম। আমি তোমার মাথাটা নামিয়ে দেব।

তালপাত। কেন ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবে? তার চেয়ে তলোয়ারটা দাও, আমিই মাথাটা রেখে চলে যাই।

আলি আব্বাসের প্রবেশ।

আলি। তুমি একটি প্রকাণ্ড গর্দ্দভ।

তালপাত। গর্দ্দভ ত সবাই বলে। কিন্তু তোমার মত প্রকাণ্ড কেউ বলে না। তুমি ভালবাস বলেই বললে।

আলি। নবাবের এত কাছে কাছে থেকেও তুমি এখনও তাকে জহর খাইয়ে মারতে পারলে না?

তালপাত। পারব কি করে? ওই পুরন্দর হতভাগা সব সময় দশটা চোখ মেলে চেয়ে থাকে।

গোলাম। পুরন্দর যখন ত্রিপুরায় ছিল, তখন কাজ হাসিল করতে পার নি?

তালপাত। আর বলো না মিঞা। পুরন্দর গেল ত ওই ব্যাটা ফকির কুতব-উল-আলম উড়ে এসে জুড়ে বসল।

আলি। তুমি একদম ষাঁড়ের গোবর।

তালপাত। বেগমসাহেবাও তাই বলে।

আলি। চোখ নেই তোমার? দেখতে পাচ্ছ না, নবাবের চোখে বাঙালী ছাড়া আর সবাই অবাঞ্ছিত? রাজ্যের সব উচ্চপদ থেকে অ-বাঙালীদের হটিয়ে দিয়ে বাঙালীদের বহাল করেছে।

গোলাম। তোমাকে ত শুনছি কথায় কথায় চাবুক মারে।

তালপাত। ভাবলে জুতোপেটা করে না।

গোলাম। হুঁশিয়ার তালপাত সিং।

আলি। কি খবর নিয়ে এসেছ?

তালপাত। মিঞার যে আজকাল দেখাই নেই। আমার বাকি পাওনাটা দাও দেখি।

আলি। পাওনা!

তালপাত। চোখ কপালে তুললে যে? এক হাজার দিয়েছিলে, আর একহাজার কে দেবে?

আলি। আমি তোমায় খুন করব।

তালপাত। টাকাটা দিয়ে খুন কর।

গোলাম। কাজ না করেই টাকা?

তালপাত। তোমরা যে কাজ না করেই মাইনে নাও, তখন ত একথা মনে থাকে না। নতুন নবাব সাত বছর আগে মসনদে বসেছে। এই সাত বছরে তোমরা অ-বাঙালী মনসবদার, থানাদার,

কোতোয়ালের দল কি কাজ করেছ মিঞা? ও কথা থাক, টাকা কটা দাও, চলে যাই।

আলি। যা দিয়েছি, তা ফেরৎ দাও; নইলে তোমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব। কাজ হাসিল না করে টাকা বদমায়েস?

তালপাত। গাল দিও না হাবশীসাহেব। জলের সঙ্গে বিষ দিলুম, ফকির জলটা খেয়ে ফেললে। চেষ্টা ত কম করি নি; না পারলে কি করব?

আলি। না পারলে মরবে। [তরবারি নিষ্কাসন]

কম্পিত দেহে, কাণা বৃদ্ধ চাষীর বেশে
হোসেন শা'র প্রবেশ।

হোসেন। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করবেন না জনাব। ও ব্যাটা ডোম।

গোলাম। } ডোম!
আলি। }

হোসেন। এজ্ঞে হ্যাঁ জনাব। ব্যাটা আগে সুবুদ্ধি রায়ের জায়-গীরে ছেল। হেঁদুর মড়া পোড়াত, আর রাজবাড়ীর পায়খানা সাফা করত।

তালপাত। দূর মিথ্যুক।

হোসেন। মারব দূর থেকে এক থাপ্পড়। আমি তোমায় চিনি নে ব্যাটা? তুমি শূয়ার বিশ বছর হাঁড়ী-বাগ্দীর মড়া পুড়িয়েছ, আজ আবার কাফের নবাবের জুতো সাফা কচ্ছ। পীরসাহেব বলেছে, এ ব্যাটার মুখ যে দেখবে, তার সাতপুরুষ দোজাকে গিয়ে বসে আছে। ওয়াক—

তালপাত। দিলে গায়ে বমি করে। এ ব্যাটারা কি সবাই এমনি গাড়োল? ছোটলোক, ইতর, শয়তানের দল। কি বল গোলাম?

[প্রস্থান]

গোলাম। শয়তানকে আমি গুলি করে খতম করব।

হোসেন। কেন গুলিটা অপবিত্র করবেন হুজুর? যানে দিজিয়ে। গুলি-ফুলি যা আছে, সব জমিয়ে রাখুন ভেতো বাঙালীদের জন্যে, আর ওই কাফের হোসেন শা'র জন্যে। হা আল্লা, কবে আমি ওর বুকের রক্তে গোসল করে নাচতে নাচতে কবরে যাব।

আলি। হোসেন শা তোমারও বুকে মই দিয়েছে বুঝি?

হোসেন। মই ত ছেলেমানুষ মিঞা। সে আমায় জানে-প্রাণে শেষ করেছে। বুঝে দেখুন ত মিঞা, আপনারা ত প্রকাণ্ড লোক। কে না জানে, পাঞ্জাব পাঞ্জাবীদের জন্যে, বিহার বিহারীদের, কাবুল কাবুলীদের, কিন্তু বাঙলা সকলের?

উভয়ে। ঠিক।

হোসেন। আমি যদি বুদ্ধির জোরে এক বাঙালী বিধবার জমি-জিরেৎ না বলে চেয়ে নিই, সে কি আমার অপরাধ?

আলি। কখনই নয়। না নেওয়াই অপরাধ।

হোসেন। এক ব্যাটা বামুন তার জরুকে খেতে দিতে পাচ্ছে না, আমি যদি ফন্দি করে তাকে এনে নিকে করি, গা ভরা গয়না দিই, ঘুঁটে-কুড়ুনীকে বেগমের হালে রাখি, সে কি আমার কসুর হল?

গোলাম। এর চেয়ে পুণ্যের কাজ আর নেই।

হোসেন। এই জন্যেতে হুজুর, নবাব আমাকে মেরে তক্তা

বানিয়ে দিয়েছে, আমার চাওয়ালকে খুন করেছে, আমার বিবিকে তার খানসামার সাথে নিকে দিয়ে দিয়েছে। বলে কিনা, বাঙলার দানাপানি বাঙালীদের জন্যে। হাবশী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, কাবুলীদের যদি এদেশে থাকতে হয়, তারা পায়ের কাদা হয়ে থাকবে, মাথায় কখনও উঠবে না।

গোলাম। সে নিজে যেমন সুবুদ্ধি রায়ের পায়ের কাদা হয়েছিল।

আলি। তুমি বলতে পারলে না, আপনি নিজে অ-বাঙালী হয়ে অ-বাঙালীদের বেইজ্জৎ করছেন?

হোসেন। জিজ্ঞেস করেছিলুম। বল্লে,—আমার বাপ-মা ছেল আরবের মানুষ। আমি জন্মেছি বাঙলার মাটিতে। বাঙলা আমার মা, বাঙালীরা আমার বেয়াদার।

আলি। মাথা উড়িয়ে দেব। আমরা বিদেশীরা গায়ের রক্ত জল করে দেশটাকে ফলে ফুলে সাজিয়েছি, আর আমাদের সঙ্গে বেইমানি? কে গড়েছে এত মসজিদ? কোথায় ছিল এত বাঁধা সড়ক? এত বন্দর; এত মক্তব, এত দীঘি পুষ্করিণী কোনখানে লুকিয়ে ছিল? এই আলি আব্বাস লাখো লাখো ভেতো বাঙালীকে অস্ত্র ধরতে শিখিয়েছে; কত হেঁদুকে কলমা পড়িয়েছে; তার সংখ্যা নেই।

হোসেন। আমি এখন কি করব হুজুর? সত্যি সত্যি কি আমাদের দেশে ফিরে যেতে হবে?

আলি। কেন ফিরে যাবে? দুদিন সবুর কর। হিন্দুর ক্রীতদাস ওই হোসেন খাঁকে আমরা মসনদ থেকে টেনে এনে জ্যান্ত কবর দেব, আর মসনদে বসাব মুজাঃফর শা'র ছেলে মজিদ খাঁকে।

হোসেন। সেইদিন কবে আসবে হুজুর?

আলি। আর দেরী নেই মিঞা। যেখানে যত অ-বাঙালী আছে, সবাইকে জনাব মজিদ খাঁর পতাকাতলে সমবেত হতে বল। মুখে মুখে খবর পৌঁছে দাও, আর ঠিক একমাস পরে জুম্মাবারে রাত দুপুরে যখন পীর সবুরের দরগায় ঘণ্টা বাজবে, তখন আমরা রাজধানী আক্রমণ করব।

হোসেন। ব্যস—ব্যস, আমরা চারদিকে খবর রটিয়ে দিচ্ছি। হুজুর, হাবশী হুজুর, আমার একটা আরজ আছে। হোসেন শা'র কবরে আমি পেরথোম থুথু দেব; তারপর আপনারা মাটি দেবেন। সে আমার সর্ব্বনাশ করেছে, আমি তার মুখে দলা দলা থুথু দেব, তবে আমার নাম শেখ আমজাদ আলি বেগ। সেলাম হুজুর, সেলাম।

[প্রস্থান।

আলি। কি খবর গোলাম রসুল?

গোলাম। খবর ভাল জনাব। ত্রিপুরা আর ইরাণ থেকে আসছে এক জাহাজ করে অস্ত্র। কাবুল গাড়ী গাড়ী রসদ চালান দিয়েছে। হোসেন শা'র কবরের ডাক এল।

[প্রস্থান।

আলি। কবে আসবে অস্ত্র আর রসদ?

আফজল খাঁর প্রবেশ।

আফজল। এসে গেছে জনাব।

আলি। শোভান আল্লা! কোথায় রেখেছ সব?

আফজল। সেই পাতালপুরীতে।

আলি। কেউ দেখতে পায় নি ত?

আফজল। কাকপক্ষীও নয়। যেখানে যত অ-বাঙালী আছে, সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে ঠিক একমাস পরে জুম্মাবারে রাতদুপুরে আমরা রাজধানী আক্রমণ করব।

আলি। আমরা সবাই তাহলে প্রস্তুত?

মজিদের প্রবেশ।

মজিদ। আমি কিন্তু প্রস্তুত নই আলি আব্বাস।

আলি। এ আপনি কি বলছেন শাহজাদা?

মজিদ। ঠিকই বলছি।

আফজল। আমাদের সব আয়োজন যে সম্পূর্ণ হয়েছে।

মজিদ। এবার অসম্পূর্ণ কর।

আলি। নানা দেশ থেকে অস্ত্র-শস্ত্র রসদ গোলা-বারুদ এসে পড়েছে।

মজিদ। ফেরৎ পাঠিয়ে দাও। এ বিদ্রোহে আমার মন আর সায় দিচ্ছে না।

আলি। আপনার রাজ্য উদ্ধারের জন্যে সাত বছর ধরে আমরা অবিশ্রাম চেষ্টা করেছি। আজ তরী কূলের কাছে এসেছে, আর আপনি বলছেন সব আয়োজন পণ্ড করে দিতে? মসনদ আপনি চান না?

মজিদ। না।

জুলিয়ার প্রবেশ।

জুলিয়া। ধিক্ তোমাকে কাপুরুষ। তোমার মহামান্য পিতা যার হাতে প্রাণ দিয়েছেন, তোমার ভাইয়ের রক্তে যার জল্লাদের

দল গোসল করেছে, তার মত দুশমনকে তুমি ক্ষমা করতে চাও? তোমার ছেলের শোচনীয় মৃত্যুও কি ভুলে গেছ?

মজিদ। ভুলি নি বেগম। কিন্তু এও ভুলতে পাচ্ছি না, সাত বছর আগে বাঙলা ছিল মরুভূমি, চোর ডাকাত জল্লাদ আর লম্পটের লীলা-নিকেতন। আর আজ সেই বাঙলাই হয়েছে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা শান্তির বিচিত্র তপোবন।

জুলিয়া। শাহজাদা!

মজিদ। অকারণে আর কারও ঘর পোঁড়ে না, কারও সম্পদ আর কেউ লুঠ করে না, রামের দোষে রহিমকে আর শাস্তি ভোগ করতে হয় না। কত বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, কত ভেতো বাঙালী আজ সিংহের সঙ্গে লড়াই করতে শিখেছে, মসজিদের আজানের সঙ্গে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি মিশে কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত রচনা করেছে দেখতে ত পাচ্ছ?

জুলিয়া। তুমিও ত দেখতে পাচ্ছ, মুসলমান সুলতানের দরবারে অধিকাংশ অমাত্য হিন্দু? দেখতে পাচ্ছনা অ-বাঙালী মুসলমানের উপর তার বিজাতীয় বিদ্বেষ? সিপাহশালার হয়েছে মনসবদার, মনসবদার হয়েছে সামান্য সৈনিক।

আফজল। এরপর একদিন বলবে, বাঙলায় অ-বাঙালীদের স্থান আর হবে না।

মজিদ। অ-বাঙালীরা যদি মনে করে যে ভেতো বাঙালী তাদের নফর মাত্র, যদি গাছের ফল খেতে এসে তারা গাছটাকে শুদ্ধ চিবিয়ে খেতে চায়, তাহলে তার পরিণাম এই ত হয় আলি আব্বাস। এখানে থাকতে যদি হয়, এ জাতটাকে ভালবেসে বুকে টেনে নাও, দেখবে এতখানি দরদ দুনিয়ার কোন জাতের নেই।

কিন্তু অত্যাচার যদি সীমা ছাড়িয়ে যায়, কেঁচোও ফণা তুলে দংশন করবে। হুঁশিয়ার।

আলি। ওসব কথা আমরা অনেক শুনেছি। আপনি কি করতে চান, তাই বলুন।

জুলিয়া। তোমার পিতার মসনদ তুমি চাও না?

মজিদ। না। দীর্ঘ বিশ বছর পরে বাংলার মানুষ আজ সুখের মুখ দেখতে পেয়েছে। তাদের এ সুখের ঘরে আগুন জ্বালাতে চেও না বেগম।

আফজল। পিতৃহন্তাকে আপনি ক্ষমা করবেন?

আলি। ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবেন না?

মজিদ। আমায় পাগল করো না আলি আব্বাস!

জুলিয়া। পাগল হতে আরও কি বাকি আছে তোমার? তোমার স্ত্রী আমি, রাজরাজেশ্বরী হয়ে আজ পথের ভিখারিণী। কার জন্যে?

মজিদ। হোসেন শার জন্যে নয়।

জুলিয়া। কেন তোমাকে তোমার মা শৈশবে ছাইয়ের উপর রেখে বলি দেয় নি? কেন বুকের রক্ত জল করে তোমাকে মানুষ করেছিল? এত অপদার্থ তুমি, তা বুঝতে পারি নি।

মজিদ। গোঁসা করো না বেগম। ভাল করে ভেবে বল, কি চাও তুমি।

জুলিয়া। যে বাড়ীতে আমি বউ-বেগম ছিলাম, সে বাড়ীতে আমি বেগম হতে চাই।

মজিদ। তাই হবে জুলিয়া। আলি আব্বাস, আমি প্রস্তুত—হ্যাঁ আমি প্রস্তুত। চোখের জল মুছে ফেল জুলিয়া। দুর্ভাগা

বাঙলায় আবার রক্তস্রোত বয়ে যাক। তুমি সুখী হও, শুধু তুমি সুখী হও।

[প্রস্থান।

আলি।
আফজল } জয় শাহজাদা আবদুল মজিদের জয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

জুলিয়া। বয়ে যাক রক্তের স্রোত, আসুক বন্যা—আসুক প্লাবন, হোসেন শার মৃত্যু চাই, বাঙলার মসনদ চাই।

[প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সুবুদ্ধি রায়ের প্রাসাদ।

গীতকণ্ঠে কুসুমের প্রবেশ।

কুসুম। গীত।

আবার কবে দেখা হবে, সেই আশাতে আমি,
বসে আছি (হে) প্রিয়তম জাগিয়া দিবস-যামি।

শঙ্করীর প্রবেশ।

[কুসুম গাহিতে লাগিল]

তোমার স্মৃতি মধুমাখা
অন্তরে মোর নিত্য আঁকা,
জনমে জনমান্তরে তুমি জীবন স্বামী।

যেথায় আছ, সুখে থাকো,
আমার তরে ভেবো না ক,
আমি তোমার চিরদিনের চরণ অনুগামী।

শঙ্করী। কুসুম,—

কুসুম। কি মা?

শঙ্করী। আবার তুই নির্জ্জলা একাদশী শুরু করেছিস? আমি না তোকে বলেছি, আমরা মরে যাবার পর ঘটা করে একাদশী করিস। আমাদের চোখের উপর কচি মেয়ে তুই উপোস করে শুকিয়ে মরবি, আর আমরা গ্রোগ্রাসে রাজভোগ খাব? আমাদের কি তুই শান্তিতে থাকতে দিবি না?

কুসুম। কি করবে মা? যার যেমন অদৃষ্ট। ঘটা করে রাজপুত্র জামাই এনেছিলে,—রূপে কন্দর্প, বিদ্যায় বৃহস্পতি, বীরত্বে দেব সেনাপতি। বরাতে সইল না। একটা আকস্মিক বজ্রাঘাতে সোনার ইমারত ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

শঙ্করী। যা হবার তা হয়ে গেছে। আমরা ত সাত বছর ধরে বলে আস'ছ, আবার তোর বিয়ে দেব; কিছুতেই তোকে রাজি করাতে পারলুম না।

কুসুম। বিধবাকে বিয়ে করতে কোন রাজপুত্র এগিয়ে আসবে মা?

শঙ্করী। রাজপুত্র ছাড়া কি দেশে সুপাত্র নেই?

কুসুম। ফুটো চাল দিয়ে যাদের ঘরে আকাশের জল গড়িয়ে পড়ে?

শঙ্করী। কি যায় আসে তাতে? আমরা অর্দ্ধেক রাজ্য যৌতুক দেব।

কুসুম। খোদার উপর খোদকারি চলে না মা। অর্দ্ধেক রাজ্য যৌতুক দিয়ে যে ময়ুরছাড়া কার্ত্তিক তোমরা নিয়ে আসবে, তিনদিন পরেই দেখবে, তাকে সাপে কেটেছে, না হয় বাঘে খেয়েছে। তোমার মেয়ের ভাঙ্গা শাঁখা আর জোড়া লাগবে না। কেন অনর্থক আর একটা মানুষকে অপঘাতে মারবে?

শঙ্করী। অনর্থক? কতদিন ত আর্সিতে মুখ দেখিস নি। দেখলে বুঝতে পারতিস, কেন আমাদের এত জ্বালা। বিধবা যুবতী মেয়ে বাপের বাড়ীতে থাকলে মানুষ নামধারী জানোয়ারের দল চারিদিকে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়।

কুসুম। মা!

শঙ্করী। বিধর্ম্মীর রাজত্ব। আমাদের জন্যে এখানে আইন নেই, বিচার নেই, কার কাছে কি বলব? এতবড় রাজপুরীতে একটা বিশ্বাসী লোক আমি দেখতে পাচ্ছি না। আজ যদি সেই হতভাগা আলাউদ্দিনটা থাকত, তাহলে আমার ভাবনার কিছু থাকত না।

কুসুম। আবার তার কথা কেন মা? তোমাদের মেয়ের মুখে সে উচ্ছিষ্ট ফল তুলে দিয়েছিল, সে পাষণ্ডের নাম কি মুখে আনতে আছে?

শঙ্করী। দুঃখ কি একটা? অমন জলজ্যান্ত জামাই অপঘাতে প্রাণ দিলে, নবাবের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা বলে আত্মীয়-স্বজন সবাই আমাদের ত্যাগ করেছে, তার উপর মহারাজ আজ সাত বছর নবাবী খাজনা বন্ধ করে বসে আছেন। কবে যে নবাবীফৌজ এসে বাড়ীটা দলে চষে দিয়ে যাবে, তার ঠিক নেই।

কুসুম। এতদিন দেয় নি কেন, এই ত আশ্চর্য্য। নবাব বোধহয় লোক খুব ভাল।

শঙ্করী। ভাল হলে তোর এ দশা হবে কেন? কথা শোন কুসুম। ভাল পাত্রের সন্ধান পেয়েছি আমরা। তোকে সে দেখেছে। তুই রাজি হয়ে যা।

কুসুম। তোমাদের জাত যাবে না?

সুবুদ্ধি রায়ের প্রবেশ।

সুবুদ্ধি। যার অর্থ আছে, তার জাত যায় না।

কুসুম। অর্থ ত সেদিনও তোমার ছিল বাবা, যেদিন তোমার ভৃত্য উচ্ছিষ্ট ফল আমার মুখে তুলে দিয়েছিল বলে তোমার জাত গিয়েছিল। যে অদৃষ্ট আমাকে আজ ঘরছাড়া করেছে, সে অদৃষ্ট নয় বাবা, তোমার কর্ম্মফল।

সুবুদ্ধি। কুসুম!

কুসুম। তোমার সেই চাবুক তরবারি হয়ে তোমার কাঁধের উপর নেমে এসেছে বাবা। এর নাম প্রকৃতির প্রতিশোধ।

[প্রস্থান।

শঙ্করী। কবে তুমি ওকে পার করবে?

সুবুদ্ধি। আমাকে বলে লাভ নেই রাণি, তুমি বরং যমকে ডাক।

শঙ্করী। যম কি আর আছে? মরে ছাই হয়ে গেছে। উচ্ছন্ন যাক। তুমি জোর করে হতভাগীর বিয়ে দিয়ে দাও। সমাজ বাদী হয়, আমরা একঘরে হয়ে থাকব। এতটুকু মেয়ের এ নির্জ্জলা একাদশী আর আমি সইতে পারব না, পারব না।

[প্রস্থান।

সুবুদ্ধি। মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙ্গে। না—না, কিসের দেবতা? কোথায় দেবতা? দেবতা নেই।

সুদর্শনের প্রবেশ।

সুদর্শন। পিতা, একজন রাজপুরুষ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে।

সুবুদ্ধি। কে রাজপুরুষ? আমার সঙ্গে রাজপুরুষের কি সম্বন্ধ? নাম কি লোকটার?

সুদর্শন। নাম আপনাকেই বলবে। লোকটাকে দেখলে সাক্ষাৎ যমদূত বলে মনে হয়। কথা-বার্ত্তাও অত্যন্ত কর্কশ।

সুবুদ্ধি। তাড়িয়ে দাও। বোধহয় নবাবের দূত। নবাবকে যখন আমি স্বীকার করি না, তখন তার দূতকেও ভূত বলে মনে করি।

সুদর্শন। আমাদের সাত বছরের খাজনা বাকি পড়েছে। নবাব বোধহয় বকেয়া খাজনা নিতে লোক পাঠিয়েছেন। যদি অনুমতি করেন, খাজনাটা দিয়ে দিই।

সুবুদ্ধি। কাকে খাজনা দেব? হোসেন শা'কে? আমি তার বশ্যতা স্বীকার করি নি, করবও না।

সুদর্শন। অভিমান ত্যাগ করুন পিতা। নবাব হোসেন শা' আগে যাই করে থাকুন, বাঙলাদেশে তিনি সত্য সত্যই শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি বুঝতে পাচ্ছি না, সাত বছর ধরে কেন তিনি আমাদের বিদ্রোহ সহ্য কচ্ছেন? এ তাঁর অসীম ধৈর্য্যের পরিচয়।

সুবুদ্ধি। ধৈর্য্য নয় সুদর্শন। আমার হাত থেকে খাজনা নেবার সাহস তার নেই। নবাব হোসেন শা'কে জান? আমাদের সেই ক্রীতদাস আলাউদ্দিন।

সুদর্শন। আলাউদ্দিন! না—না, তা কি করে হবে? সে ছিল গণ্ডমূর্খ, আর নবাব সুশিক্ষিত আলেম।

সুবুদ্ধি। চাঁদ কাজী তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে, অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিয়েছে, তারপর রাজদরবারে উচ্চপদও সংগ্রহ করে দিয়েছিল। নিজের একমাত্র কন্যাকেও কাজী তার হাতে সমর্পণ করেছে। চাঁদ কাজীর কুশাগ্রবুদ্ধি আর নিজের শৌর্য্য-বীর্য্যের ফলে ক্রীতদাস আলাউদ্দিন আজ বাঙলার ভাগ্যবিধাতা। আমি নিজের চোখে তাকে দেখে এসেছি।

সুদর্শন। তাই কি নবাব আপনাকে স-সম্মানে মুক্তি দিয়েছেন? কিন্তু এ কথা ত আপনি কখনও বলেন নি।

সুবুদ্ধি। বললে তোমার মা নবাবকে আশীর্ব্বাদ করতে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যেত, আর তোমার ভগ্নী—যাক, তারা যেন নবাবের আসল পরিচয় না পায়। বুঝেছ?

সুদর্শন। বুঝেছি। কিন্তু—

সুবুদ্ধি। তুমি কি বলতে চাও, আমাদের ভূতপূর্ব্ব ক্রীতদাসকে আমরা আভূমি সেলাম করে রাজকর দিয়ে আসব?

সুদর্শন। কেন দেব না পিতা? সবার আগে আমাদেরই তাকে অভিবাদন করা উচিত ছিল। আপনার আনন্দ হচ্ছে না? যে মৃতকল্প শিশু আমাদেরই অন্নজল খেয়ে বেঁচে উঠেছে; সে আজ নিজের গুণে বাঙলার ভাগ্যবিধাতা। তার গৌরবের আমরাও ত অংশীদার।

সুবুদ্ধি। থাম। গৌরব! নিজের অন্নদাতাকে হত্যা করে, যে মসনদে বসেছে, তার গৌরবে গোটা বাঙলাদেশটা নাচতে হয় নাচুক, কিন্তু সুবুদ্ধি রায় কখনও নাচবে না।

সুদর্শন। আপনি তার অন্নদাতা; আপনার সঙ্গে ত তিনি বেইমানি করেন নি। মুজাঃফর শা ছিলেন বাঙলার মহাশত্রু। তাঁর অকালমৃত্যু তাঁর নিজেরই কর্ম্মফল।

আলি আব্বাসের প্রবেশ।

আলি। বিলকুল ঝুট। মুজাঃফর শা এ মেরুদণ্ডহীন ভেতো বাঙালী জাতটাকে আঘাত দিয়ে দিয়ে চাঙ্গা করতে চেয়েছিলেন। সেই হল তাঁর কসুর। এই শয়তান হোসেন খাঁ বেইমানি করে তাকে খুন করেছে।

সুবুদ্ধি। খাঁ সাহেবকে ত চিনতে পাচ্ছি না।

আলি। আমার নাম আলি আব্বাস।

সুদর্শন। নবাবের সিপাহশালার?

আলি। এখন আর সিপাহশালার নই। নবাব হোসেন শা মসনদে বসেই হাবশী আমীর উজির সিপাহশালার মনসবদার সবারই উপর আঘাত হেনেছেন। আমীর হয়েছে হাবিলদার, উজির হয়েছে নাজির, আর সিপাহশালার হয়েছে দোহাজারি মনসবদার।

সুবুদ্ধি। লোকটা নিকৃষ্ট হলেও এই একটা বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। শুনেছি দরবারে আর একজনও অ-বাঙালী নেই।

আলি। যত সব ভেতো বাঙালী দরবার আলো করে বসে আছে। আরও আশ্চর্য্যের কথা তারা অধিকাংশই হিন্দু।

সুদর্শন। কি অন্যায়!

আলি। অথচ এ রাজ্যের যা কিছু উন্নতি, সব হাবশীদের জন্যে।

সুবুদ্ধি। আর যা কিছু অশান্তি, সেও তাদেরই জন্যে।

আলি। মহারাজ যেন রহস্য কচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে।

সুদর্শন। রহস্য নয় মিঞা। নবাবের মতিগতি যা দেখছি, অ-বাঙালীদের ডালরুটি এ দেশ আর বেশীদিন জোগাবে না। মার খেয়ে পালানোর চেয়ে আপনারা মানে মানে বিদেয় হয়ে যান।

[প্রস্থান।

আলি। ওই ছোকরা কে রাজা?

সুবুদ্ধি। আমার ছেলে।

আলি। এমন অপদার্থ ছেলে আপনার?

সুবুদ্ধি। কামলা রোগীর চোখে গোলাপও হলদে দেখায়।

আলি। যানে দিজিয়ে। আমি কেন এসেছি জানেন?

সুবুদ্ধি। না।

আলি। শুনুন রাজা, আমরা নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব।

সুবুদ্ধি। আনন্দের কথা।

আলি। হোসেন শাকে আমরা মসনদ থেকে টেনে নামিয়ে দেব।

সুবুদ্ধি। দাও না।

আলি। হোসেন শা বেইমান, নেমকহারাম, পাষণ্ড।

সুবুদ্ধি। আরও যত গাল আছে দাও, আমার কোন আপত্তি নেই।

আলি। তার এ শয়তানি আমরা কিছুতেই বরদাস্ত করব না।

সুবুদ্ধি। আমরা কারা? তোমরা হৃতসর্ব্বস্ব হাবশীর দল?

আলি। শুধু হাবশী নয়। হাবশী, ইরাণী, ইস্পাহানী, খোরাশানী, কাশ্মীরী—সবাই। অ-বাঙালী মাত্রেই নতুন নবাবের হাতে নির্য্যাতীত। আমাদের অনুরোধ, আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিন।

সুবুদ্ধি। আমি ত অ-বাঙালী নই।

আলি। নাই বা হলেন। আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যান নি, যে নবাবের হুকুমে আপনার জামাই নিহত।

সুবুদ্ধি। ভুলি নি আলি আব্বাস। সে জন্য যদি পারি তার সঙ্গেই আমি বোঝাপড়া করব। তোমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেব, আর তোমরা আমার মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে কোয়া ভক্ষণ করবে, এ সুযোগ আমি তোমাদের দেব না মিঞা।

আলি। রাজা,—

সুবুদ্ধি। পার হোসেন শাকে নামিয়ে দিয়ে তুমি নবাব হয়ে বসো, বাঙালীর ভিটেয় ঘুঘু চরাও, আমি বাধাও দেব না, তোমাদের সাহায্যও করব না।

আলি। আপনি ভুল বুঝেছেন রাজা সুবুদ্ধি রায়। নবাবী আমরা চাই না, আমরা চাই শাহজাদা আবদুল মজিদকে মসনদে বসাতে।

সুবুদ্ধি। কোথায় শাহজাদা? তিনি কি জীবিত আছেন? তবু একটা সুসংবাদ শোনালে আলি আব্বাস। আমি তাকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করব না, করব কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়ে। সাত বছরের রাজকর আমি জমিয়ে রেখেছি, হোসেন শাকে দিই নি, সব আমি দিয়ে দেব শাহজাদা মজিদকে। তাঁকে নিয়ে এস।

আলি। কত টাকা?

সুবুদ্ধি। বিশ হাজার টাকা।

আলি। শোভান আল্লা! তাই দিন। আমাদের অস্ত্র আছে, সৈন্য-সামন্ত আছে, নেই শুধু অর্থ। আপনার দেওয়া এই অর্থ

আমাদের যুদ্ধ জয় সুনিশ্চিত করবে। আমি শাহজাদাকে নিয়ে আসছি, আপনি টাকাটা দেবার ব্যবস্থা করবেন আসুন।

[প্রস্থান।

সুবুদ্ধি। জ্বলুক, আগুন দাউ দাউ করে জ্বলুক; সেই আগুনে হোসেন শা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাক।

[প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

আদিনা ও তালপাত সিংয়ের প্রবেশ।

আদিনা। তুই শূয়ার তাড়ি খেয়েছিস।

তালপাত। তুমি তাড়ি খেয়েছ।

আদিনা। নতুন নবাবের সুশাসনে বাঙলার এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত ধন্য ধন্য রব পড়ে গেছে, চাটগাঁইয়া বাঙালরা পর্য্যন্ত বলছে, "হ, এদ্দিন বাদে একটা লবাবের মত লবাব খাড়াইছে, বুইজ্য নি তালুই?" আর তুই বলছিস, দুশমনরা তাকে গদী থেকে নামিয়ে দিতে চায়? বিলকুল ঝুট।

তালপাত। আমি নিজের কাণে শুনে এয়েছি।

আদিনা। তুই রাম শুনতে রামছাগল শুনেছিস।

তালপাত। বলছি ত ভগবানের দোহাই।

আদিনা। তোর ভগবানকে মানছে কে? আল্লার কিরে দিতে পারিস ত বিশ্বাস করব।

তালপাত। আল্লার নাম করবে তালপাত সিং? পঁচিশ বছর তোমাদের নকরি কচ্ছি, কোনদিন তোমাদের ছোঁয়া জল খেতে দেখেছ?

আদিনা। জল খেতে নাই বা দেখলুম; নিজের হাতে এঁটো কাঁটা সাফ করতে ত দেখেছি।

তালপাত। সে তোমায় ছেনো করি বলে। তাই বলে মোছল-মানের হাতের জল খাব?

আদিনা। না খাবি ত বেরো।

তালপাত। তুমি বেরোও। বলছি তুমি জাঁহাপনাকে খবরটা জানিয়ে দাও। কথাই গেরাহ্যি হচ্ছে না।

আদিনা। আমি ওসব গাঁজাখুরি কথা বলতে পারব না। একে পাগল, তার উপর আরও ক্ষেপে যাবে।

তালপাত। পাগল পাগল করো না। এ রকম মানুষ ছোট-লোকের ঘরে আর দেখেছ? বলে কিনা পাগল!

আদিনা। পাগল ত বটেই, তার উপর কাফের।

তালপাত। তবে তুমি ওকে সাদি করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিলে কেন?

আদিনা। ক্ষেপে উঠেছিলাম মড়া?

তালপাত। তালপাত সিং কিছু জানে না? কাজীসাহেব যত বলে,—'ভাল করে ভেবে দেখ', ততই বলে,—'ভাবা হয়ে গেছে; হয় আমি ওকে বিয়ে করব, না হয় একদম করবই না'।

আদিনা। দূর মিথ্যুক।

তালপাত। মিথ্যুক তুমি। তুমি বলেই অমন খসমকে হেনস্তা কর, আর কেউ হলে মাথায় করে রাখত।

আদিনা। মাথায় করে রাখব না কোলে করে রাখব। হাজার হাজার মুসলমানকে মুখের কথায় খুন করে ফেললে।

তালপাত। বেশ করেছে। অন্যায় করলে খুন করবে না? তোমার মাথাটা কবে যায় তাই দেখ। ও ব্যাটারা যখন রাজধানীতে হানা দেবে, তখন তুমি ভেবেছ মুসলমানী পকাতা উড়িয়ে দেবে। তার আগে আমি তোমায় খুন করব।

আদিনা। তা না হয় করলি, কিন্তু তুই আবার পকাতা বললে তোকে আমি খুন করব।

তালপাত। তুমি জাঁহাপনাকে কথাটা বলবে কিনা, তাই বল।

আদিনা। তোর গাঁজাখুরি কথা তুই গিয়ে বল।

তালপাত। আমি ত বলেছিলুম; কাণেই তুললে না।

আদিনা। তুলবে কেন? তুই তাদের গোপন আড্ডায় গেলি; আর তারা তোর মাথাটা নিলে না?

তালপাত। নিয়েছিল ত। এক মোছলা বুড়ো এসে আমার গায়ে বমি করে দিলে। ওরা আর ঘেন্নায় ছুঁলে না।

আদিনা। হেঃ-হেঃ!

তালপাত। হেঃ-হেঃ মানে?

আদিনা। গাঁজা।

তালপাত। [থলি বাহির করিয়া] তাহলে এই মোহরগুলোও গাঁজা?

আদিনা। এ যে অনেক মোহর রে! কার ঘরে সিঁধ কেটেছিস?

তালপাত। বাজে কথা বলো না। মোহর দিয়েছে সেই হাবশী শূয়ার।

আদিনা। কোন হাবশী শূয়ার?

তালপাত। নাম বলতে পারব না। মা কালীর দিব্যি কেটেছি। আমার বিশ্বাস করে এক হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছে। কেন জান? নবাবের পানিতে বিষ মিশিয়ে দেবার জন্যে।

আদিনা। কবে বিষ দিবি?

তালপাত। যে মাসে একাদশী নেই।

[প্রস্থান।

আদিনা। কে বললে নবাবের বন্ধু নেই? আমীর ওমরাহ না থাক, চাষী, তাঁতী, কামার, কুমোর ত আছে। আরও আছে পুরন্দর পরাগল খাঁ, আর এই ছোটলোক অ-বাঙালী খানসামা।

চাঁদ কাজীর প্রবেশ।

চাঁদ কাজী। এসব কি দেখছি আদিনা?

আদিনা। কে, বাপজান? এতদিন পরে তুমি এলে? কেন? মক্কা মদিনা কি পাখা মেলে উড়ে গেছে, আজমীড় শরীফ কি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যে তুমি এত শীগ্‌গির ঘরে ফিরে এলে? তীর্থের মাটি আর ভাল লাগল না বাপজান?

চাঁদ কাজী। মাথায় থাক তীর্থের মাটি। পাঁচ বছর তীর্থে তীর্থে ঘুরে আমি কিছুই দেখতে পাই নি, শুধু দেখেছি তোমাদের দুই দুশমনের মুখ। মক্কায় এক ত্রিকাল জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী শুনে কিছুতেই আর মনের চাঞ্চল্য দমন করতে পারলুম না, ছুটে এলুম আবার তোমাদের মাঝখানে।

আদিনা। কিসের ভবিষ্যদ্বাণী বাবা? জ্যোতিষী বুঝি বললে, তোমার আদিনার মরণ ঘনিয়ে এসেছে?

চাঁদ কাজী। তোবা—তোবা! মরবে কেন মা? আজ তুমি বাঙলার রাজ্যেশ্বরী, কাল হয়ত হবে দিল্লীর পাতশা বেগম। আমি জানি হোসেন শার মত বীর সংসারে বেশী জন্মায় না, তার জন্যে হয়ত দিল্লীর মসনদ অপেক্ষা করছে। কিন্তু এসব কি আদিনা? মুসলমান নবাবের প্রাসাদে এত হিন্দু মহাপুরুষের ছবি দেখছি কেন?

আদিনা। কারণ মহাপুরুষদের নাকি কোন জাত নেই।

চাঁদ কাজী। দরবারে নাকি বহু উজির আমীর কবি গায়ক হিন্দু?

আদিনা। দু-একজন মুসলমানও আছে।

চাঁদ কাজী। মন্ত্রীরাও কি হিন্দু?

আদিনা। দুজন নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত। নাম রূপ গোঁসাই আর সনাতন গোঁসাই।

চাঁদ কাজী। নবদ্বীপ! তায় উপর গোঁসাই!

আদিনা। তবে তাদের নাম এখন আর রূপ সনাতন নয়, সাকর মল্লিক আর দবীর খাস।

চাঁদ কাজী। ইসলাম গ্রহণ করেছে?

আদিনা। পাগল হয়েছ? তোমার জামাইকে কবে হিন্দু করে নেয়, তাই দেখ।

[নেপথ্যে কাঁসর-ঘণ্টাধ্বনি]

চাঁদ কাজী। ও কি আদিনা?

আদিনা। রূপগোস্বামী পূজো কচ্ছেন।

চাঁদ কাজী। পূজো করবার কি আর জায়গা ছিল না?

আদিনা। এ জায়গাটা ত খারাপ নয়। দেখছ না, মসজিদের পাশে জাঁহাপনা কি সুন্দর শ্বেত পাথরের মন্দির তৈরী করে দিয়েছেন।

চাঁদ কাজী। আশ্চর্য্য!

আদিনা। অবাক হয়ে দেখছ কি বাপজান? পাঁচ বছর তুমি ছিলে না; এই পাঁচ বছরে গঙ্গায় অনেক জল গড়িয়ে গেছে। অ-বাঙালী রাজপুরুষেরা হতমান হয়ে প্রাণের ভয়ে হাজারে হাজারে নকরী ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। কত মুসলমান জায়গীরদার যে পথে বসেছে, তার সংখ্যা নেই; কত হিন্দু ফকির যে আমীর হয়েছে, তারও হিসেব নেই। দেশ জুড়ে রব উঠেছে, বাঙলার বন্ধু মহানুভব সুলতান হোসেন শা। তারই পাশে আর একটা চাপা গুঞ্জন অস্ফুট বেদনায় গুমরে ওঠে বাবা,—"ইসলামের দুশমন কাফের হোসেন শাকে খতম কর।"

চাঁদ কাজী। তুমি থাকতে রাজধানীতে এসব অনাচার!

আদিনা। আমি কি করব? কিছু বললেই জবাব দেয়,—মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করো না। নমাজ পড়তে জোর করে বসিয়ে দিই। কি বলে জান? তুমিই আল্লা, তুমিই ভগবান, তুমিই গড। আমার দেশবাসীদের দোয়া কর দয়াময়।

চাঁদ কাজী। জ্যোতিষী মিথ্যা বলে নি। গোটা বাঙলাদেশটাকে অঙ্গুলিহেলনে চালন করবে ওই নবদ্বীপের এক মুকুটহীন সম্রাট। হোসেন শা তলিয়ে যাবে, জাতি ধর্ম্ম সমাজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। আমি তা হতে দেব না। চাঁদ কাজীর বার বছরের সাধনা নিষ্ফল হবে না আদিনা। হজরৎ রসুলের রক্ত ওর ধমনীতে বইছে। আমি ওকে আবার হিন্দুর ক্রীতদাস হতে দেব না, কিছুতেই না।

[প্রস্থান।

আদিনা। তিনদিন ধরে কোথায় গিয়ে পড়ে রইল বল দেখি। একমাসের তিনদিন কেটে গেল, বাকি আছে মোটে সাতাশ দিন। তারপরেই ত দুশমনেরা প্রাসাদ আক্রমণ করবে। এ যে আর কাউকে বলাও যায় না। ওই আসছে।

হোসেন শা'র প্রবেশ।

হোসেন। ঘুমুস নে আর, নে হাতিয়ার,
বাঙলা মায়ের ছেলের দল,
দস্যু এসে নিচ্ছে লুটে,
তোদের ঘরের মুক্তাফল।

আদিনা। আ—হা—হা।

হোসেন। দু-দশ হাজার দস্যু ওরা,
কোটি কোটি জওয়ান তোরা,
জংলী পশুর মাথা নিতে কোমর বেঁধে এগিয়ে চল।

আদিনা। কবিতা রেখে একটা কথা শোন।

হোসেন। না থাক অসি, ধর না লাঠি,
প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাটি,
ভয় কি তোদের, আছে সাথে সাতপুরুষের পুণ্যফল।

আদিনা। আর দেখতে হবে না। সবাই হাতা-খুন্তি লাঠি নিয়ে পিলপিল করে বেরিয়ে পড়েছে।

হোসেন। কে? বেগম? কি বলছ বেগম?

আদিনা। বলছি তোমার জ্বালায় আমি কি মাথা খুঁড়ে মরব?

হোসেন। কেন—কেন, মরবে কেন?

আদিনা। বাঁচবই বা কোন সুখে? নবাবের বেগম আমি, নবাবের কুৎসা শুনতে শুনতে আমার কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল। কত সইব আমি বল।

হোসেন। যে সয়, সে রয়।

আদিনা। তুমি বাঙলার নবাব, তোমার কি মান-ইজ্জৎ বলে কিছু নেই?

হোসেন। তা আছে বই কি?

আদিনা। কোথায় ছিলে সারাদিন? কোন চাষীর কুঁড়ে ঘরে বসে তার দুঃখের কাহিনী শুনছিলে? আর এদিকে আমি যে পথের দিকে চেয়ে বসে আছি, সে কথা কি তোমার মনে নেই?

হোসেন। থাকবে না কেন? দেবীগঞ্জে মড়ক লেগেছে শুনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলাম। ফিরে আসবার সময় শুনলাম, শুকদেব ঠাকুরের আশ্রমে চণ্ডীপাঠ হচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখলাম, দশভুজার পদতলে বসে শুকদেব উদাত্ত কণ্ঠে মহাশক্তিকে আহ্বান কচ্ছে। বাহ্যজ্ঞান নেই, চোখে পলক পড়ছে না, সে কি প্রাণস্পর্শী আবাহন। আমার মনে হল, মাটির প্রতিমা সজীব হয়ে উঠেছে। ভুলে গেলাম যে আমি মুসলমান, ভুলে গেলাম যে আমি বাঙলার ভাগ্যবিধাতা। সেই মন্দিরের চত্বরে বসে ঠাকুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও বলে উঠলাম,—

"শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে,
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।"

আদিনা। তুমি বললে?

হোসেন। বললাম, মাটিতে লুটিয়ে প্রণামও করলাম।

আদিনা। প্রণাম করলে হিন্দুর দেবতাকে?

হোসেন। আমার মনে হল, এ মা সবার মা, এর কোন জাত নেই। তারপর কি হল জান?

আদিনা। কি?

হোসেন। ঠাকুর মাটিতে কলাপাতা বিছিয়ে দিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ ঢেলে দিলে।

আদিনা। তুমি খাও নি নিশ্চয়ই।

হোসেন। এমন অমৃত কখনও খাই নি বেগম।

আদিনা। কেউ দেখতে পায় নি ত?

হোসেন। কয়েকজন মোল্লা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে আর থুথু ফেলেছে।

আদিনা। তবে ত তোমার হয়েই গেল। সাধে কি আর মুসলমানেরা তোমাকে বলে কাফের? এরপর একদিন সবাই হৈ-হৈ করে এসে তোমার গর্দ্দান নেবে।

হোসেন। তাহলে উপায়?

আদিনা! মক্কায় চল।

হোসেন। এই ত আমার মক্কা আদিনা। এমন পাখিডাকা নদনদীহারমেখলা শ্যামা বঙ্গভূমির চেয়ে মক্কা কি বেশী সুন্দর? এই দুঃখদৈন্য-নিপীড়িত সব থাকতে সর্ব্বহারা নরনারীর সেবার চেয়ে তীর্থভ্রমণে কি বেশী পুণ্য হবে বেগম? দীনদুনিয়ার মালেক খোদা-তাল্লাকে আমি ডাকি নি সত্য, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে আমি ভালবেসেছি। তাঁর সন্তানকে সেবা করলে যদি তিনি সন্তুষ্ট না হন, তবে তাঁর সন্তোষ আমি চাই না। আমি দোজাকে যাব, তবু সমাজের উপরে নমাজকে স্থান দেব না।

আদিনা। শোন—শোন, আসল কথাটাই বলা হল না।

হোসেন। কি কথা?

আদিনা। আচ্ছা, আলি আব্বাস এখনও তোমার নকরি করে?

হোসেন। বেতন যখন নিচ্ছে, নকরি অবশ্যই করে।

আদিনা। শাহজাদা মজিদ কোথায় আছে জান?

হোসেন। না।

আদিনা। গোলাম রসুল, আফজল খাঁ—এইসব হাবশীরা যথা-রীতি কাজ করে?

হোসেন। মর্জি হলে করে, না হয় করে না।

আদিনা। এরা তোমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে?

হোসেন। রাজভক্তির ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়।

আদিনা। দেখ, আমি কখনও স্বপ্ন দেখি না। কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখলুম, সব অ-বাঙালী মুসলমান আর দু-চারশো দিশী কাঠমোল্লা তোমার রাজধানী আক্রমণ করতে আসছে। কবে আসবে জান? আর সাতাশ দিন পরে, অমাবস্যার রাত্রে।

হোসেন। তুমি যখন স্বপ্ন দেখেছ, তখন এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তুমি ভেবে না বেগম। আমি তাদের আক্রমণের মোকাবেলা করার জন্যে তৈরী হয়ে থাকব।

আদিনা। কে যেন আসছে। আমি যাই। খোদাতালা তোমায় দোয়া করুন।

[প্রস্থান।

হোসেন। কি আমার অপরাধ? আমার দেশবাসীকে আমি ভালবাসি, এ কি অন্যায়? মোল্লারাও আমার মৃত্যু চায়? আমি মরব, তবু সমাজী না হয়ে নমাজী হব না।

গীতকণ্ঠে কুতবের প্রবেশ।

কুতব। গীত

ডাকিস না তুই আল্লাতালায়, নমাজ আদায় করিস না,
দেবের দেউল ভেঙ্গে দিয়ে ভজনালয় গড়িস না।
আর্ত্তযারা সর্ব্বহারা,
মুছাও তাদের নয়নধারা,
বাঙলা মা তোর তীর্থভূমি, ভুলে গিয়ে মরিস না।
জীবের সেবাই ধর্ম্ম ওরে,
কে বলেছে কাফের তোরে,
শেয়ালগুলো চেঁচিয়ে মরুক, পথ থেকে তুই সরিস না।

হোসেন। সেলাম হজরৎ।

কুতব। কত পাঠশালা তৈরী করে দিয়েছ হোসেন?

হোসেন। বিশ হাজার।

কুতব। বহুৎ আচ্ছা বেটা।

হোসেন। কিন্তু একটা কসুর করে ফেলেছি হজরৎ। প্রত্যেক পাঠশালার জন্যে মৌলবী যেমন বহাল করেছি, তেমনি পণ্ডিতও নিয়োগ করেছি, উভয়ের একই মাসোহারা।

কুতব। তাই ত হবে বাপজান। হিন্দু-মুসলমান উভয়েই তোমার প্রজা। আর বিদ্যার কোন জাত নেই। তোম্ জিন্দা রহো বেটা।

হোসেন। মাথায় হাত দেবেন না হজরৎ, আমার জাত গেছে। বেগম আর আমায় ঘরে নিতে চাইছে না।

কুতব। কেন?

হোসেন। শুকদেব আচার্য্যের আশ্রমে আমি চণ্ডীপাঠ শুনেছি, পূজোর প্রসাদও খেয়ে এসেছি।

কুতব। তাতে তোমার জাত যায় নি, জাতের মর্য্যাদা আরও বেড়েছে। তুমিই বাঙলার উপযুক্ত নবাব। [প্রস্থান।

হোসেন। ওরে অভিমানী কাঠমোল্লার দল, তোরা শুনে যা, হোসেন শা কাফের নয়। ও বেগম, ও বেগম,—

পুরন্দরের প্রবেশ।

পুরন্দর। জাঁহাপনা!

হোসেন। দূর বে-রসিক! যখন তখন রাজকার্য্য নিয়ে এলেই হল?

পুরন্দর। না এসে উপায় ছিল না। কামতাপুর থেকে এসে সারাদিনের মধ্যে একবারও আপনার সাক্ষাৎ পাই নি।

হোসেন। আর পাবেও না। বেগম বলেছে আমায় নিয়ে মক্কায় যাবে।

পুরন্দর। মক্কা যাবেন আপনি!

হোসেন। কেন, আমি গেলে মক্কা সরে যাবে নাকি?

পুরন্দর। তা নয়। কিন্তু আপনি ত নমাজও পড়েন না।

হোসেন। পড়ি—মনে মনে।

পুরন্দর। মক্কাও আপনার মনের মধ্যেই আছে। আপনার যাওয়া হবে না।

হোসেন। তুমি আমায় তীর্থ করতে দেবে না নাকি?

পুরন্দর। আপনার তীর্থ এই বাঙলার মাটি। জাঁহাপনা, নমাজ পড়ে পূজো করে সব রাজবাদশারাই ঢাকঢোল বাজিয়ে স্বর্গে যেতে চায়। বাঙলার এই দীনদুঃখী মানুষগুলোর সেবা করে আপনি না হয় নরকেই যাবেন। পাঁচকোটি আর্ত্ত নরনারীর আশীর্ব্বাদে সেই নরকই হবে স্বর্গধাম।

হোসেন। চাহি না তোমার স্বর্গ মালেক, করো না আমারে দোয়া,
মানুষেরে ভালবাসিলে ধর্ম্ম সব যদি যায় খোয়া,
আর্ত্তসেবার মহান যজ্ঞে জীবন আহুতি দিয়া,
বিরাম লভিব কবরে তাদের পদধূলি শিরে নিয়া।

পুরন্দর। জাঁহাপনা!

হোসেন। আজ কি তিথি?

পুরন্দর। বোধহয় দ্বাদশী।

হোসেন। অমাবস্যার রাত্রে আমি ঘোড়দৌড় দেখতে চাই, পারবে দেখাতে?

পুরন্দর। অমাবস্যার রাত্রে ঘোড়দৌড়!

হোসেন। রাজধানীতে সেদিন আলো জ্বলবে না। রাত দুপুরের সময় প্রধান রাজপথে পাঁচশো ঘোড়া ছুটিয়ে দেবে। রাস্তার এ মাথায় থাকবে তুমি আর ও মাথায় থাকবে পরাগল খাঁ। প্রত্যেকের সঙ্গে পাঁচ হাজার সৈন্য থাকবে। বাকি সৈন্য নিয়ে আমি থাকব প্রাসাদের মধ্যে।

পুরন্দর। আপনার উদ্দেশ্য কি, আমি বুঝতে পাচ্ছি না।

হোসেন। তোমার মাথা যে এত পরিষ্কার, তা আমার জানা ছিল না। অমাবস্যার রাত্রে শত্রুরা রাজধানী আক্রমণ করবে।

পুরন্দর। কোন শত্রু?

হোসেন। সময়ে দেখতে পাবে।

পুরন্দর। আপনি যখন জানেন, তখন অমাবস্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন কি? কালই আমরা তাদের আক্রমণ করব।

হোসেন। না পুরন্দর, তাদের কোন গুপ্ত ঘাঁটিতে প্রচুর বিদেশী অস্ত্রসম্ভার আছে। সে ঘাঁটির সন্ধান আমি পাই নি। আগে এ

অস্ত্রসম্ভার গোপন ঘাঁটি থেকে রাজপথে বেরিয়ে আসুক; তারপর আমরা তা করায়ত্ত করব।

পুরন্দর। কিন্তু ঘোড়া ছুটিয়ে দেবার অর্থ কি?

হোসেন। পাঁচশো ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনে তারা মনে করবে, নবাবী সৈন্য ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই তাদের অর্দ্ধেক সৈন্য পলাতক হোসেন শার পশ্চাদ্ধাবন করবে, আর অর্দ্ধেক সৈন্য প্রাসাদের দিকে ছুটবে। পরাগল খাঁ পেছন থেকে তাদের আক্রমণ করবে, আর আমি প্রাসাদের মধ্যে তাদের সম্ভাষণ করব। প্রাসাদে সেদিন আমরা ছাড়া আর কেউ থাকবে না। কি ভাবছ পুরন্দর?

পুরন্দর। ভাবছি, আপনার কাছে আমি শিশু। কিন্তু,—

হোসেন। কিছু বলবে?

পুরন্দর। জাঁহাপনা, আমার মনে হচ্ছে, অ-বাঙালী সৈনিকেরা আপনার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছে।

হোসেন। আমার নসীব।

পুরন্দর। নসীব নয়। এ আগুন আপনি নিজেই জ্বালিয়ে তুলেছেন। এদের আপনি পদে পদে অসম্মান করেছেন। এতটা না করলেই ভাল হত।

হোসেন। তুমি ত তখন বললে না। এখন উপায়? তুমি আমাকে রক্ষা করতে পারবে না?

পুরন্দর। পারব কিনা জানি না; তবে আমি আপনার জন্যে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হব না। আমার একটা অনুরোধ, আমাকে সঙ্গে না নিয়ে আপনি রাজধানীর বাইরে কখনও যাবেন না।

[প্রস্থান।

হোসেন। রাজত্বই যদি করতে হয়, বাঙলাদেশে অ-বাঙালীর শোষণ আমি বরদাস্ত করব না।

চাঁদ কাজীর প্রবেশ।

চাঁদ কাজী। তোমার আগের নবাবরা কিন্তু বরদাস্ত করেছে হোসেন শা।

হোসেন। আমি তাঁদের অযোগ্য উত্তরাধিকারী।

চাঁদ কাজী। শুনেছি, অসংখ্য মুসলমানকে তুমি হত্যা করেছ।

হোসেন। মুসলমানও নয়, হিন্দুও নয়, দুপেয়ে জানোয়ারদের হত্যা করেছি জনাব।

চাঁদ কাজী। ভাববিলাসিতা ছাড় বাপজান। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, গোটা মুসলমান সমাজ বিরোধী হলে তুমি নবাবী করতে পারবে না।

হোসেন। নবাবী নিয়ে জন্মাই নি, নবাবী না থাকলে আফ-শোষের কিছু নেই।

চাঁদ কাজী। এ তোমার কি নীতি হোসেন শা? মুসলমানদের জমি কেড়ে নিয়ে তুমি হিন্দুদের দান করেছ?

হোসেন। করেছি। কারণ জমিগুলো আগে ওই সব হিন্দুদেরই ছিল।

চাঁদ কাজী। এ তোমার অশোভন হিন্দুপ্রীতি। সুবুদ্ধি রায় সাত বছর খাজনা দেয় নি, সে খবর রাখ?

হোসেন। কই, খাজাঞ্চি ত আমায় বলে নি।

চাঁদ কাজী। আজই বিশজন সৈন্য পাঠিয়ে দাও। হয় সে সম্পূর্ণ রাজস্ব পরিশোধ করবে, না হয় তাকে বেঁধে নিয়ে আসবে।

হোসেন। না—না, সৈন্য-সামন্তের দরকার নেই। আমি পুরন্দরকে

পাঠিয়ে দেব। খাজনা দেবে না, এ কি কথা? বোধহয় তাঁর মনে নেই। কে যেন বলছিল, জামাইয়ের শোকে মানুষটা সেই যে শয্যা নিয়েছে, আর ওঠে নি।

চাঁদ কাজী। তার ছেলে ত আছে।

হোসেন। ছেলেটা একদম বাজে লোক। আচ্ছা, আপনি পথ-শ্রমে ক্লান্ত; এখন গিয়ে বিশ্রাম করুন। সংসারের এ আবর্জ্জনার মধ্যে আপনার ফিরে না আসাই উচিত ছিল। মক্কা মদিনা ছেড়ে কেন আপনি ফিরে এলেন?

চাঁদ কাজী। সাধে কি এসেছি? এক বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী আমায় দেখেই বললে, কেন এখানে এসেছ? ঘরে ফিরে যাও মিঞা। দুনিয়ার সর্ব্বতীর্থ গিয়ে মিশেছে বাঙলাদেশের নবদ্বীপে। সেখানে এমন এক অসাধারণ মহাপুরুষ জন্মেছে, যার অঙ্গুলিহেলনে গোটা বাঙলাদেশ চালিত হবে, নবাব বাদশা তলিয়ে যাবে। আসলে সে-ই হবে বাঙলার সম্রাট।

হোসেন। উদয়াগিরির শিরে ফুটিবে কি সে উষার আলো,
আঁধার লুকাবে মুখ, দগ্ধ হবে পুঞ্জীভূত কালো?
মূক মুখে দেবে ভাষা, হাতে দেবে অসি খরশান,
এস তুমি পরিত্রাতা, পায়ে তব অর্ঘ্য করি দান।

[প্রস্থান।

চাঁদ কাজী। খোদার মার, দুনিয়ার বার। গড়েছিলাম শিব, হয়ে গেল শব। নসীব, নসীব।

[প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ।

তালপাত সিংয়ের প্রবেশ।

তালপাত। ব্যাপারটা ত ভাল বোধ হচ্ছে না। রাজবাড়ীর সবাইকে সরিয়ে দিয়ে সেপাই-শান্ত্রীরা এসে ঘরে ঘরে ঘাপটি মেরে বসে আছে। সদর রাস্তায় এত ঘোড়াই বা দাঁড় করিয়ে রেখেছে কেন? হাবশী শয়তানেরা আজই আসবে না কি? আসুক একবার, আব্বাস ব্যাটার বাপের বিয়ে আমি দেখিয়ে দেব, তবে আমার নাম তালপাত সিং। [ডন বৈঠক দিতে লাগিল]

আদিনার প্রবেশ।

আদিনা। এই, কৌন হ্যায় তেম্?

তালপাত। তফাৎ যাও। আমার এখন শরীর গরম।

আদিনা। হতভাগা তালপাত সিং? তুমি এই রাত দুপুরে ব্যায়াম কচ্ছ? ব্যাপার কি?

তালপাত। ব্যাপার গুরুতর। জাঁহাপনা যে তোমাদের বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বললে, গেলে না?

আদিনা। কেন যাব, সেটা ত বুঝতে পাচ্ছি না।

তালপাত। মেয়েছেলেরা আবার বুঝবে কি? শাস্ত্রে বলেছে, মেয়েদের মাথায় নির্জ্জলা ষাঁড়ের গোবর। তারা শুধু রাঁধবে, আর কাঁদবে।

আদিনা। চোপরাও বেয়াদব।

তালপাত। আরে দূর। মামদো ব্যাটারা এসে পড়লে তখন আমরা তোমাকে সামলাব, না যুদ্ধ করব?

আদিনা। যুদ্ধ করবি তুই?

তালপাত। কেন, ভক্তি হচ্ছে না? নসীবের দোষে খানসামাগিরি করি বলে কি জাতের ধর্ম্ম ভুলে গেছি? পঁচিশ বছর বয়সে আমি একদিন বনে কাঠ কাটতে গিয়েছিলুম। হঠাৎ এক ব্যাটা মোছলা সিংহ আমায় আক্রমণ করলে। আমি কুড়ুলের এক কোপে বাছাধনকে দুখানা করে ফেললুম। মরার পরও মাথাটা "ইয়া আল্লা, ইয়া আল্লা" করতে লাগল।

আদিনা। বীরপুরুষ বটে।

তালপাত। আর একবার নদীতে নাইতে নেমেছি; একটা হিন্দু কুমীর আমার পা কামড়ে ধরলে। আমি তার দুটো চোখে এমন আঙুল ঢুকিয়ে দিলুম যে সে ব্যাটা "বাপরে, মারে" বলে পালিয়ে গেল।

আদিনা। গাঁজায় দম দিলে ও রকম হয়। কারা আসছে, তাই বল।

তালপাত। সেই যে মামদো শয়তানদের কথা বলেছিলুম, তারা এল বলে। কবে তোমাকে বলেছি, জাঁহাপনাকে বলে হাবশী ব্যাটাদের সাবাড় কর।

আদিনা। সে আমার কথা শোনে নাকি মড়া?

তালপাত। না শোনে মরগে যাও। তেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে, আজ পর্য্যন্ত তুমি সোয়ামীকে বশ করতে পারলে না! এত করে বললুম, ভালমানুষের ছেলেকে নবাব হতে দিও না, কথাই শুনলে না।

আদিনা। কবে বলেছিলি? তুই-ই ত বেশী নেচে উঠেছিলি।

তালপাত। মিছে কথা বলো না। এসব কি ভদ্রলোকের কাজ? হাবশী শয়তানেরা চারিদিকে ছুরি শানাচ্ছে। মিঞার গায়ে যদি একটা কাঁটার আঁচড় লাগে, তাহলে তোমাকে ত খুন করবই, তোমার বাবাকেও এই ভীমবাহু দিয়ে তুলে আছাড় মারব।

হোসেন শা'র প্রবেশ।

হোসেন। কাকে আছাড় মারবে সিংজি? আমাকে নাকি?

তালপাত। আরে যাও মিঞা। হাজারবার বলেছি, ওই মামদো ব্যাটারা আপনাকে সরিয়ে দেবার ফন্দি আঁটছে। আপনার গ্রাহ্যই হয় না। ব্যাটাদের খতম করতে কদিন লাগে?

হোসেন। মুসলমানরা সবাই ত আমার বিরোধী। সব মুসলমানকেই খতম করতে হবে নাকি?

তালপাত। ক্ষতিটা কি? মুসলমান না থাকলে কি হয়? আমি আপনাকে গোবরের সরবৎ খাইয়ে হিন্দু করে নেব।

হোসেন। বেগমকেও শরবৎ খাওয়াবে নাকি?

তালপাত। দূর—দূর। এ রকম লোক হিন্দু হলে হিন্দু ধর্ম্মটাকেই চিবিয়ে খাবে। ওকে কবরে পাঠিয়ে দিন।

হোসেন। তাই দেব। এখন তুমি তোমার ব্রাহ্মণীর কাছে যাও, আমি আমার ব্রাহ্মণীর সঙ্গে একটু রসালাপ করি।

তালপাত। কখখনো যাব না। আমি বুঝেছি, আজ তারা আসবে। হাবশী ব্যাটা যদি আপনার কাঁধের উপর অস্ত্র তোলে, তাহলে আমি তার বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। নইলে বৃথাই আমার নাম তালপাত সিং।

[প্রস্থান।

আদিনা। আচ্ছা, এই গাধাটাকে তুমি কি একটা ধমকও দিতে পার না?

হোসেন। গাধার দুধ বড় মূল্যবান বেগম। আর তার মত বোঝা বইতেও কেউ পারে না।

আদিনা। মুসলমান খানসামার এতই কি অভাব যে একটা হিন্দু খানসামাকে না হলে নবাবের চলে না? লোকটা মুসলমানদের দুচক্ষে দেখতে পারে না।

হোসেন। দেখতে পারে না তোমার পিতাকে। তোমাকে আর আমাকে লোকটা অত্যন্ত ভালবাসে।

আদিনা। এ আমি বিশ্বাস করি না।

হোসেন। বিশ্বাস করে দেখ, এ জাতের মত বিশ্বাসের মর্য্যাদা কেউ রাখে না। কিন্তু তোমার ত এ সময় এখানে থাকার কথা নয়। সবাই চলে গেছে আর তুমি এখনও রাজপ্রাসাদে।

আদিনা। তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না। আমি বুঝতে পাচ্ছি, কোন প্রবল শত্রু আজ প্রাসাদে হানা দেবে।

হোসেন। দিলেই বা তুমি কি করবে? আমার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে?

আদিনা। যুদ্ধ না করি, আড়াল থেকে বর্শা ছুঁড়তে ত পারব।

হোসেন। তুমি বর্শা ছুঁড়বে?

আদিনা। আমি আর আমার ছেলে নসরৎ।

হোসেন। বালক নসরৎকেও এই বিপদের বেড়াজালের মধ্যে টেনে এনেছ? এমনি করে আর কতদিন আমায় বেঁধে রাখবে বেগম? মুসলমান সমাজ কাফের বলে আমায় বর্জ্জন করেছে, অ-বাঙালী রাজপুরুষেরা আমার ধ্বংসের জন্যে মারণযজ্ঞের আয়োজন করেছে।

আদিনা। তুমিও ত ভাল কাজ কর নি। মসনদে বসে তুমি অ-বাঙালীদের রাজসরকার থেকে উচ্ছেদ করার আয়োজন করেছ। তার উপর বাঙালী মুসলমানদের পর্য্যন্ত ক্ষেপিয়ে তুললে?

হোসেন। তাদের মুখ চেয়ে হিন্দু প্রজাদের আমি পায়ের তলায় পিশে মারতে চাই নি; এই কি আমার অপরাধ?

আদিনা। কিন্তু,—

হোসেন। হিন্দু-মুসলমানকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে যেতে আমি হয়ত পারব না আদিনা। যদি অকালে আমায় সরে যেতে হয়, নসরৎকে আমার অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে বলো। তোমরা বিশ্বাস করো, হোসেন শা কাফের ছিল না, মানুষ ছিল; সে খোদাকে ডাকে নি, কিন্তু তাঁর সন্তানদের ভালবেসেছিল।

আদিনা। মোল্লারা এ কথা বুঝবে না।

হোসেন। যাও আদিনা, কে যেন ছুটে আসছে।

আদিনা। আসতে দাও। শয়তানেরা দেখে যাক, যে আদিনা বেগম নারী, কিন্তু অবলা নয়।

[প্রস্থান।

হোসেন। তোমারে আমি ডাকি নি বলে করো না অভিমান,
তোমার চেয়ে আমার প্রিয় তোমারি ত সন্তান।
চাহি না ক্ষমা, দোজাকে যাব, যেতেই যদি হয়,
দেশের মানুষ রইল সুখে, এ মোর দিগ্বিজয়।

পরাগল খাঁর প্রবেশ।

পরাগল। জাঁহাপনা, হাজার হাজার লোক মেঠো পথ বেয়ে ছুটে আসছে।

হোসেন। আসবে।

পরাগল। ওরা কারা?

হোসেন। আলি আব্বাসের দল।

পরাগল। কেন আসছে ওরা?

হোসেন। কাফের হোসেন শা'কে খতম করতে।

পরাগল। আমরা তাহলে এখন কি করব?

হোসেন। ওরা আর একটু কাছে এলে ঘোড়াগুলোকে চাবুক মেরে হাঁকিয়ে দেবে।

পরাগল। তাতে কি লাভ হবে?

হোসেন। ওরা মনে করবে, আমরা পালিয়ে যাচ্ছি। ওদের অর্দ্ধেক ফৌজ ঘোড়াগুলোর পশ্চাদ্ধাবন করবে। বাকি অর্দ্ধেকের উপর তুমি ঝাঁপিয়ে পড়বে। প্রাসাদ-তোরণ খোলাই রইল। যারা ভেতরে প্রবেশ করবে, তাদের খেদমত করার জন্য আমি আছি।

পরাগল। আপনি,—

হোসেন। আমি একা নই, তোমার কাছে যে তিনহাজার সৈন্য চেয়ে নিয়েছিলাম, তারা প্রাসাদের ঘরে ঘরে আত্মগোপন করে আছে।

পরাগল। কিন্তু প্রাসাদ-তোরণ খুলে রাখার অর্থ কি?

হোসেন। অর্থ এখনও বোঝ নি? আলি আব্বাসকে পলায়নের সুযোগ আমি দেব না। এই হাবশী শয়তানকে বাঙলার মাটিতে আমি জ্যান্ত কবর দেব। যদি আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ওরা প্রাসাদ দখল করে, তাহলে তালপাত সিং ঘণ্টাধ্বনি করবে। তুমি তখন রাজপ্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেবে। বাঙলার শাসনদণ্ড বাঙালীর হাতেই যেন থাকে পরাগল খাঁ, অ-বাঙালীর স্পর্শে সে যেন আর কলঙ্কিত না হয়।

পরাগল। বঙ্গেশ্বর সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শা'র জয়।

[কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় শাহজাদা আবদুল মজিদের জয়"।]

হোসেন। আইয়ে জনাব, আইয়ে। হামলোক ভি তৈয়ার হ্যায়। ওই পাঁচশো ঘোড়া কদমে ছুটে যাচ্ছে; শত শত দুশমন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে। হোসেন শা সসৈন্যে পালাচ্ছে,—মার ডালো কাফের সুলতান কো। [নেপথ্যে জয়ধ্বনি—জয় নবাব হোসেন শা'র জয়।] ওই পরাগল খাঁ আক্রমণ করেছে। একদল দুশমন প্রাসাদের দিকে ছুটে আসছে না? [দূরবীন চোখে দিয়া] হাঁ—হাঁ, সব হিসেব হুবহু মিলে যাচ্ছে। আ যাও হাবশী কুত্তা, অন্দরমে ঘুস যাও; মনসবদার হাবিলদার সিপাহীলোক খেদমত করনেকো তৈয়ার হ্যায় জনাব। [তূর্য্যধ্বনি]

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে জয়ধ্বনি—"জয় বঙ্গেশ্বর সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শা'র জয়।]

মজিদ ও আলি আব্বাসের প্রবেশ।

মজিদ। তুমি না বলেছিলে রাজপ্রাসাদ শূন্য? তবে এত বর্শা ছুটে আসছে কোথা থেকে?

আলি। তাই ত—গুপ্তচর যে বললে, রাজপ্রাসাদে জন-মানবের চিহ্নমাত্র নেই, নবাব সপরিবারে তাঁর অমাত্যদের নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন।

মজিদ। গুপ্তচরকে তুমি চেন?

আলি। আমি না চিনলেও আফজল খাঁ চেনে।

মজিদ। আফজল খাঁ বলবে, গোলাম রসুল চেনে। তোমাদের সেই গুপ্তচর হয়ত নবাবী ফৌজের সঙ্গে মিশে যুদ্ধ করছে। দশ হাজার ফৌজ নিয়ে আমরা এসেছিলাম। তিন হাজার পলায়িত অশ্বারোহীদের পশ্চাদ্ধাবন করে কোন ভাগাড়ে গিয়ে মরেছে ঠিক নেই, চার হাজার সৈন্য পরাগল খাঁর খপ্পরে পড়ে কি অবস্থায় আছে জানি না। অবশিষ্ট তিন হাজার নিয়ে তুমি প্রাসাদ অধিকার করতে ছুটে এলে,—আর আমি এলাম মসনদে উপবেশন করতে। এগিয়ে দেখ, তিন হাজারের তিনজনও জীবিত আছে কিনা সন্দেহ।

আলি। শাহজাদা!

মজিদ। আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমার মাথাটা আমি ধড় থেকে নামিয়ে দিই। রাজত্বের খোয়াব টুটেছে মিঞা। শ্বেতপতাকা উড়িয়ে দাও, নবাবের কাছে আত্মসমর্পণ করি গে চল।

আলি। আত্মসমর্পণ করব কাফেরের কাছে। তার চেয়ে প্রাণ দেওয়া অনেক সহজ।

মজিদ। তোমার ও কুত্তার প্রাণ না থাকাই ভাল। কিন্তু যারা বেঁচে আছে, তাদের আর আমি মরতে দেব না। আমি নিজেই শ্বেতপতাকা উড়িয়ে দেব।

আলি। তার আগে আমিই আপনাকে হত্যা করব। [তরবারি তুলিল]

পশ্চাতে তরবারি হস্তে নিঃশব্দে গুপ্তচরের ছদ্মবেশে হোসেন শা' আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মজিদ। তাহলে তোমাকে মারবে তোমার ওই গুপ্তচর।

[আব্বাস পিছন ফিরিল। মজিদের প্রস্থান।]

আলি। কে? মেহের আলি?

হোসেন। জী।

আলি। মিথ্যাবাদী, শয়তান, প্রবঞ্চক, তোমাকে আমি—একি, কে তুমি?

হোসেন। তোমার শাহানশা, তামার বাঙলার অধীশ্বর সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শা। বেইমান, নেমকহারাম, দোজাকের কীট, বাঙলার নেমক খেয়ে বাঙালীর অজস্র রক্ত শোষণ করেছ তুমি, তবু তোমায় আত্মশুদ্ধির সুযোগ দিয়েছিলাম। তুমি জন্মপাপী, তাই ক্ষমাকে মনে করেছ কাপুরুষতা। আর কোন বক্তব্য আছে তোমার?

আলি। না, জাতিদ্রোহী ধর্ম্মদ্বেষী কাফেরের কাছে আমার কোন বক্তব্য নেই।

হোসেন। তবে আল্লার নাম স্মরণ কর।

[আক্রমণ, আব্বাসের প্রতিরোধ, উভয়ের যুদ্ধ; পতিত আব্বাসের তরবারি ছিনাইয়া নিয়া হোসেন তাহার বুকে পা দিয়া দাঁড়াইলেন।]

হোসেন। তোমার একটা একটা করে অঙ্গচ্ছেদন করে ডাল-কুত্তা লেলিয়ে দেব। কৈ হ্যায়?

সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক। জাঁহাপনা,—

হোসেন। বন্দী কর। [সৈনিক আব্বাসকে বন্দী করিল] নিয়ে যাও, বাইরে জবরদস্ত খাঁ অপেক্ষা করছে। তাকে বলবে, এই পাষণ্ডকে যেন অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করে প্রহরে প্রহরে চাবুক মারে। পনের দিন পরে প্রকাশ্যে আমি ওকে চরম শাস্তি দেব।

সৈনিক। চলে আয় শয়তান।

[আব্বাস সহ প্রস্থান।

হোসেন। ব্যস, কেল্লা ফতে।

পরাগলের প্রবেশ।

পরাগল। জাঁহাপনা, শত্রুসৈন্যের অর্দ্ধেক নিহত।

হোসেন। বাকি অর্দ্ধেক পালিয়ে গেছে?

পরাগল। সবাই পালাতে পারে নি। তাদের অধিকাংশ বন্দী।

হোসেন। বন্দী পশুগুলোকে নৃশংস হত্যা কর।

পরাগল। যদি তারা আত্মসমর্পণ করে?

হোসেন। শয়তানের আত্মসমর্পণের কোন মূল্য নেই। বারবার আমি ওদের ক্ষমা করেছি, ওরা বারবারই বেইমানি করেছে। শাহজাদা বন্দী, আলি আব্বাস বন্দী, তাদের বিচার করে আমি কঠোর শাস্তি দেব। বাঘটা ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে যারা আঘাত করে জাগিয়ে দিয়েছে, তাদের শেষ রক্তবিন্দু সে শোষণ করবে।

পরাগল। জাঁহাপনা, আপনার প্রাপ্য রাজকর যদি কোন জায়গীরদার শাহজাদা মজিদ খাঁকে দিয়ে থাকে, কি তার শাস্তি?

হোসেন। মৃত্যু। না—না, তার চেয়ে কঠোর দণ্ড দিতে হবে। তার সব চেয়ে যে প্রিয়, তাকে এখানে টেনে নিয়ে এস। তারপর ভেবে দেখব, রাজদ্রোহের কি শাস্তি। যারা আমায় মানুষ হতে দিলে না, তাদের কাছে আমি দানবই হব। তারা যদি বুনো ওল, আমি বাঘা তেঁতুল। [প্রস্থান।

পরাগল। এইবার দেখব সুবুদ্ধি রায়, কত বড় রাজদ্রোহী তুমি।

[প্রস্থান।

—:০:—

পঞ্চম দৃশ্য।

বন্দিশালা।

মজিদ ও তালপাত সিংয়ের প্রবেশ।

মজিদ। এ কেমন বন্দিত্ব? হাতে পায়ে শৃঙ্খল নেই, খানা-পিনার ত্রুটি নেই, বিলাসব্যসনেরও ত কোন অভাব দেখছি না। ওহে তালপাত সিং,—

তালপাত। কি?

মজিদ। তুমি যে চটেই আছ দেখছি।

তালপাত। চটব না কেন? কোন্ আক্কেলে আপনি ওই মামদো ব্যাটাদের সাথে যোগ দিয়ে নবাবের মাথা নিতে এসেছিলেন শুনি। নবাব তার রাজ্যে আপনাকে জরু গরু নিয়ে থাকতে দিয়েছে এই বুঝি তার অপরাধ?

মজিদ। না। ওই যে তোমাদের শাস্ত্রে বলে দশচক্রে ভগবান ভূত,—আমারও তাই হয়েছিল।

তালপাত। ও ব্যাটারা ত হাবশী ভূত। আপনি ত নবাবের ব্যাটা। কাণ্ডজ্ঞান নেই আপনার?

মজিদ। তখন ছিল না, এখন একটু একটু কাণ্ডজ্ঞান হচ্ছে।

তালপাত। আপনি একটি অখাদ্য পাচন।

মজিদ। আর বাক্যযন্ত্রণা দিও না চাচা। বরং দু'ঘা মেরে হাতের সুখ কর। আচ্ছা সিংজি, আমি ত বন্দী; আমাকে এ রকম জামাই আদরে রেখেছে কেন? আমরা ত বন্দীদের দু'পায়ে মাড়াতুম। তোমার মনিবটা পাগল নাকি?

তালপাত। পাগল পাগল করলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

মজিদ। আবার বীরবাহু বিস্তার করবে নাকি? তোমার বাপ-মা কিন্তু তোমার নামটা ঠিক রেখেছিল তালপাত সিং।

তালপাত। তালপাত নয়, আমার নাম দলপৎ সিং। বদমায়েস ছোঁড়াগুলো তালপাত সিং বলে আমার নামে গান বেঁধেছিল। সেই যে নতুন নামকরণ হল, আর তা ঘুচল না।

মজিদ। ছেলেগুলোর কি বুদ্ধি!

তালপাত। দাঁত বার করতে শরম হচ্ছে না আপনার?

মজিদ। আমরা বাদশার বংশধর, আমাদের শরম থাকতে নেই।

তালপাত। শরম না থাক, ভয় ত আছে।

মজিদ। আমার আবার ভয় কি?

তালপাত। আজই আপনার গর্দ্দান যাবে, তা জানেন?

মজিদ। কি যে বল, তার ঠিক নেই। গর্দ্দান গেছে ওই বোকা সৈনিকদের, যারা চিনির বস্তাই শুধু বয়ে মরেছে, শরবৎ খেতে পায় নি। গর্দ্দান যাবে আলি আব্বাস আর আফজল খাঁর। আমি হচ্ছি 'স্থাতা', আমার গায়ে কাঁটাটিও ফুটবে না। তুমি চাচা ত শুনেছি হিন্দু ব্রাহ্মণ। বেশ ত মুসলমানদের গোলামি কচ্ছ। ক'জন হিন্দু আছ তোমরা?

তালপাত। আমরাই ত প্রায় সব।

মজিদ। পাঞ্জাবী না মারাঠী?

তালপাত। সবাই বাঙালী; আমি একা পাঞ্জাবী।

মজিদ। নমাজ-টমাজ পড় ত? ঘিউভাত খাও, না ষাঁড়ের ডালনা খাও?

তালপাত। তোমায় মাথা বেয়াকুব। আমাদের পুজোর জন্যে মন্দির আছে, রান্নার জন্যে আলাদা রসুইঘর আছে।

মজিদ। এ তাহলে মুসলমানের রাজত্ব নয়, হিন্দুমানের রাজত্ব। এইজন্যেই তোমার মনিবকে সবাই কাফের বলে।

তালপাত। তবে রে শাহজাদার নিকুচি করেছে। [কোমর বাঁধিতে লাগিল]

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। ও তালপাত সিং, শীগগির জাঁহাপনাকে খবর দাও। আসলি চিড়িয়া উড়ে গেছে।

তালপাত। আসলি চিড়িয়া? ওই হাবশী কুত্তা আলি আব্বাস? পালিয়ে গেছে? কি করে পালালো?

রক্ষী। জানালা ভেঙ্গে।

তালপাত। তোমার মাথাটা ভাঙ্গল না কেন? আমি আশা করে আছি, নিজের হাতে ব্যাটার মাথাটা ছিঁড়ব, আর এর মধ্যে লোকটা হাওয়া? আর দুটো আছে ত? ওদের এখানে নিয়ে এসে দোর বন্ধ করে দাও। কাঁপছ কি? আল্লার নাম কর। তোমার মাথা আজও গেছে, কালও গেছে। চলে এস শীগগির।

[রক্ষীর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

মজিদ। তাই ত, আলি আব্বাস পালিয়ে গেল? আবার একটা অনর্থ ঘটাবে।

বন্দী আফজল ও গোলাম রসুলের প্রবেশ।

মজিদ। এই যে তোমরা এসেছ। শরীর-টরীর ভাল আছে ত?

আফজল। কি করে ভাল থাকবে? পেট ভরে খেতে দেয় না; তার উপর—বল না হে।

গোলাম। বলবই ত। তিনবেলা ওদের জবরদস্ত খাঁ না হামান-দিস্তে খাঁ এসে ধোলাই দেয়। খাঁ সাহেব আপত্তি করেছিল বলে ওকে ত একদিন ফেলে খড়মপেটা করলে।

আফজল। থামো।

গোলাম। থামব কেন? ঢাক পিটিয়ে বলব। একি অন্যায় কথা? শাহজাদা, আপনার গায়ে ত কোন দাগ-টাগ দেখছি না।

মজিদ। আমাকে কম্বল চাপা দিয়ে মারে। কি দিয়ে মারে জান? ছেঁড়া জুতো। যত মারে, বারান্দা থেকে একটা চিড়িয়া তত্তই বলতে থাকে,—'সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়, এমনি সব গাধা, ফুটফুটে জল ঘুলিয়ে ফেলে খায় শুধু পাঁককাদা।'

আফজল। শাহজাদা, এখন উপায়? আলি আব্বাস বলেছিল, সে বেরিয়ে যেতে পারলে আমাদেরও বের করে নিয়ে যাবে। সেই ভরসায় আমরা তাকে সাহায্য করেছিলাম। সে আর এল না।

মজিদ। আসবে না। ওরা শুধু নিতেই জানে, দেয় না কিছু। মূর্খ তারা, যারা এদের ফাঁদে পা দেয়। তোমাদের আর কতটুকু অপরাধ? নবাব তোমাদের বে-ইজ্জৎ করেছিলেন। তোমাদের রাগ থাকতে পারে। কিন্তু আমার সঙ্গে ত তিনি কোন দুর্ব্যবহার করেন নি। আমি এ নরকপঙ্কে কেন পা বাড়িয়ে দিলাম?

গোলাম। আপনার পিতার রাজ্য সে কেড়ে নিয়েছে।

মজিদ। আমার পিতাও মহম্মদ শা'র রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলেন। ও রাজত্ব না থাকাই ভাল ছিল। কিন্তু হোসেন খাঁর রাজত্বে অবিচার নেই; হানাহানি নেই, কারও অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ

করে না। অকারণ আমরা রাজদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছি। মৃত্যুই আমাদের বাঞ্ছনীয়।

গোলাম। আমি কিন্তু মরে গেলে আমার অন্ধ বাপ-মাও মরে যাবে।

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে হোসেন শা' ও পশ্চাতে
পুরন্দরের প্রবেশ।

হোসেন। পুরন্দর, হাবশী শয়তান আলি আব্বাসকে নিয়ে এস। আমি নিজের হাতে তার শিরশ্ছেদ করব।

পুরন্দর। জাঁহাপনা, আলি আব্বাস কারাগার ভেঙ্গে পালিয়ে গেছে।

হোসেন। পালিয়ে গেছে? কেমন করে? আঃ—আবার সে বিদ্রোহ করবে, আবার কতকগুলো মানুষের প্রাণ যাবে। সন্ধান কর, তার মাথার জন্যে দশহাজার আশরফি পুরস্কার দেব। এই আর এক শয়তান। জল্লাদ,—

জল্লাদের প্রবেশ।

জল্লাদ। ফরমাইয়ে জাঁহাপনা।

হোসেন। এই হাবশী জানোয়ারকে অলিন্দের উপর থেকে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ কর।

আফজল। জাঁহাপনা, মাপ করুন জাঁহাপনা।

হোসেন। মাপ করব তোমাকে? এমন দুষ্কর্ম্ম নেই, যা তুমি কর নি। পূর্ব্বতন নবাবের প্রশ্রয় পেয়ে তুমি নির্ব্বিচারে লুণ্ঠন, নরহত্যা আর নারীনিগ্রহের অবাধ রাজত্ব চালিয়েছিলে। আজ তোমার পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে শয়তান। নিয়ে যাও।

আফজল। দোহাই জাঁহাপনা, আমি জন্মের মত বাঙলা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

পুরন্দর। বাঙলা ছেড়ে নয়, দুনিয়া ছেড়ে চলে যাও।

[জল্লাদ আফজল খাঁকে টানিতে টানিতে লইয়া গেল।]

হোসেন। শাহজাদা আবদুল মজিদ, মুঠোর মধ্যে পেয়েও আপনাকে আমি কারারুদ্ধ করি নি, আপনার পুরনারীদের মান-সম্ভ্রম এতটুকু ক্ষুন্ন হতে দিই নি, সেই কি আমার অপরাধ ?

মজিদ। না জনাব, অপরাধী আমি। আপনি আমায় দণ্ড দিন।

হোসেন। তাই দেব। আপনার অপরাধের একমাত্র দণ্ড মৃত্যু। [তরবারি উত্তোলন]

জুলিয়া ছুটিয়া আসিয়া হোসেন শা'র পায়ে পড়িল।

জুলিয়া। মহিমান্বিত বঙ্গেশ্বর,—

পুরন্দর। কে ?

হোসেন। মহামান্যা বউবেগম ? আদেশ করুন।

মজিদ। তুমি আবার এখানে কেন এলে বউবেগম ? চলে যাও, এখুনি চলে যাও।

জুলিয়া। না। মরতেই যদি হয়, আমিও তোমার সঙ্গে মরব। মহামান্য বঙ্গেশ্বর, আমার স্বামী রাজদ্রোহী ছিলেন না। আমিই তাঁকে এ পথে নামিয়েছি। শিরশ্ছেদ যদি করতে হয়, আগে আমার শিরশ্ছেদ করুন :

হোসেন। হোসেন খাঁ নারীর কাঁধের উপর তরবারি তোলে না।

পুরন্দর। আপনি চলে যান বিবিসাহেবা।

জুলিয়া। না। মারতে যদি হয়, আমাদের দুজনকেই মারুন।

হোসেন। তাই কর পুরন্দর। এরা সবাই রাজদ্রোহী। দুজনেরই শিরশ্ছেদ কর।

পুরন্দর। আমি অক্ষম জাঁহাপনা।

হোসেন। কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই। তুমি না পার, অগত্যা আমি নিজেই—[তরবারি উত্তোলন]

সহসা আদিনার প্রবেশ।

আদিনা। নামাও তরবারি।

সকলে। বেগমসাহেবা!

হোসেন। তুমি জান না, এরা উভয়েই রাজদ্রোহী।

আদিনা। জানি। কিন্তু তোমার মনে নেই, একদিন তুমি বউ-বেগমকে বলেছিলে,—যদি কখনও প্রয়োজন হয়, এই ভাইয়ের কাছে এস বহিন। তোমার যে কোন আরজ পূর্ণ করতে এই দীন ভাই কোনদিন পিছু হটবে না।

জুলিয়া। আজ বহিন এসেছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইতে।

আদিনা। হাতীকা দাঁত, মরদকা বাত। মনে থাকে যেন। নইলে রাজপ্রাসাদে আমি আগুন ধরিয়ে দেব।

[জুলিয়াকে লইয়া প্রস্থান।

হোসেন। যান শাহজাদা, আপনার পথ মুক্ত। কিন্তু আপনার একটা অনুচরকেও আমি বাঁচিয়ে রাখব না। যারা বাঙলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে, বাঙলার মাটি আর তাদের স্পর্শ করতে দেব না। যারা বন্দী, তাদের গুলি করে হত্যা কর পুরন্দর।

গোলাম। ইয়া আল্লা!

হোসেন। কে? সেই থেঁকী কুত্তা গোলাম রসুল? তুমি এখনও মর নি? এই মুহূর্ত্তে ওর মাথাটা নামিয়ে দাও পুরন্দর।

মজিদ। } শাহানশা!
গোলাম। }

গোলাম। [নতজানু] আমি মরে গেলে আমার অন্ধ বাপ-মা না খেয়ে মরবে।

মজিদ। ওর প্রাণভিক্ষা না দিলে আমিও মুক্তি চাই না জাঁহাপনা।

পুরন্দর। কার প্রাণভিক্ষা আপনি চাইছেন শাহজাদা? এই শয়তানই আপনার ভাইকে খুন করেছে।

মজিদ। সে আর ফিরবে না পুরন্দর। কিন্তু ওর বাপ মা বুক ফেটে মারা যাবে। আমি কথা দিচ্ছি, ওর হাত আর কারও রক্তপাত করবে না।

হোসেন। পুরন্দর,—

পুরন্দর। যাও, কাজ কর গে যাও।

মজিদ। } জয় বঙ্গেশ্বর সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শা'র জয়।
গোলাম। }

[প্রস্থান।

হোসেন। এতবড় দুশমনকে তুমি আবার কাজে বহাল করলে?

পুরন্দর। আমি করি নি, করেছেন আপনি।

হোসেন। তোমার মত নির্ব্বোধ আর আছে?

পুরন্দর। আছে।

হোসেন। কোথায়?

পুরন্দর। আমার সম্মুখে। কটা মানুষ আপনি শাহানশা? এই দেখছি আপনি মায়ের মত করুণাময়, পরক্ষণেই দেখছি আপনি হিংস্র জল্লাদ। নারীহরণ করাও আপনার পক্ষে সম্ভব হল?

হোসেন। নারীহরণ!

পুরন্দর। পরাগল খাঁকে আপনি হুকুম দিয়েছেন জায়গীরদারের কন্যাকে নিয়ে আসতে?

হোসেন। আমি হুকুম দিয়েছি! কবে? কোন জায়গীরদারের কন্যাকে? কোথায় সে?

পুরন্দর। রাজধানীর উপকণ্ঠে।

[প্রস্থান।

হোসেন। আমি হুকুম দিয়েছি? এও কি সম্ভব?

চাঁদ কাজীর প্রবেশ।

চাঁদ কাজী। একি শুনছি হোসেন? আলি আব্বাস পলায়িত?

হোসেন। হাঁ জনাব।

চাঁদ কাজী। কেমন করে সে পালিয়ে গেল?

হোসেন। রক্ষীরা বলছে, জানালা ভেঙ্গে পালিয়েছে। আমার মনে হয়, সর্ষের মধ্যে ভূত ছিল।

চাঁদ কাজী। রক্ষীদের সবাইকে কোতল কর।

হোসেন। তাতে দু-একজন নির্দোষেরও প্রাণ যাবে। দোষী মুক্তি পায় ক্ষতি নেই, কিন্তু নির্দোষ যেন শাস্তি না পায়।

চাঁদ কাজী। এ নীতিতে রাজ্যশাসন চলে না।

হোসেন। না চলে, চাই না রাজ্য।

চাঁদ কাজী। চুপ কর বাপজান। দেওয়ালেরও কাণ আছে। আলি আব্বাসের সেই শয়তান অনুচরদের কি করেছ? আফজল খাঁ আর গোলাম রসুল?

হোসেন। আফজল খাঁ নিহত। গোলাম রসুল তার চাকরিতে বহাল রয়েছে।

চাঁদ কাজী। কি বলছ তুমি? গোলাম রসুলের মত শয়তানকে তুমি জীবিত রেখেছ?

হোসেন। আমার ইচ্ছে ছিল না। ওই হতভাগা পুরন্দর,—

চাঁদ কাজী। আবার পুরন্দর? ওই পুরন্দরই তোমায় পথে বসাবে।

হোসেন। পথের মানুষ আমি, পথে বসলেও আমার কোন অসুবিধে হবে না জনাব। সে জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না।

চাঁদ কাজী। বাজে কথা রাখ। শাহজাদা মজিদকে কোথায় রেখেছ? আজই তার গর্দ্দান নাও।

হোসেন। শাহজাদা চলে গেছেন।

চাঁদ কাজী। চলে গেছে? তার অর্থ, তুমি তাকেও মুক্তি দিয়েছ?

হোসেন। আমি দিই নি, দিয়েছে আপনার মেয়ে। আমি তার কাঁধের উপর তরবারি তুলেছিলাম, বেগম এসে আমায় অত্যন্ত অপমান করে শাহজাদাকে মুক্ত করে দিলে, আর বউবেগমকে অন্দর-মহলে নিয়ে গিয়ে রাজভোগ খাইয়ে দিলে।

চাঁদ কাজী। তুমি তার কথা শুনলে কেন?

হোসেন। না শুনলে আপনি গোঁসা করবেন, তাই। নইলে স্ত্রীলোকের কথা হোসেন শা' গ্রাহ্য করে না।

চাঁদ কাজী। তুমি কি মনে করেছ, ওরা এরপর সুবোধ ছেলের

মত দেশে ফিরে যাবে? আবার তারা বিদ্রোহ করবে, তারপর মসনদশুদ্ধ তোমাকে টেনে এনে নর্দমায় নিক্ষেপ করবে।

হোসেন। তা ত করবেই। বেগম যে এমন শত্রুতা করবে, তা কি আমি জানি?

চাঁদ কাজী। আমি তাকে খুন করব।

হোসেন। দেখুন চেষ্টা করে। পদে পদে সে যদি এমনি করে আমায় অপমান করে, তাহলে রাজদণ্ড ফেলে আবার আমি গিয়ে কোদাল হাতে নেব।

[প্রস্থান।

চাঁদ কাজী। কি করলাম এতদিন? সব স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল? তাই ত,—

[প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য।

বনের পার্শ্বদেশ।

পরাগল ও ইয়াহিয়ার প্রবেশ।

পরাগল। পিঠ বাঁকাচ্ছ কেন হাওয়াই খাঁ?

ইয়াহিয়া। হাওয়াই খাঁ বলবেন না হুজুর। আমার নাম মীর মহম্মদ ফয়জুদ্দিন ইয়াহিয়া খাঁ। আমার নানীসাহেবের দুলুভাইয়ের তালুই ছিল বিশ্ববিখ্যাত সম্রাট মিহিরগুল।

পরাগল। তবে ত তুমি মস্তলোক।

ইয়াহিয়া। নসীবের দোষ হুজুর। বাঙলা মুল্লুকে এসে কেউটে সাপ ঢোঁড়া হয়ে গেছি।

পরাগল। এতবড় একটা লোক তুমি বাঙালীর মার খেয়ে পিঠ বাঁকাচ্ছ? সুবুদ্ধি রায়ের ছেলে সুদর্শন খুব প্রহার দিয়েছে বুঝি?

ইয়াহিয়া। যানে দিজিয়ে সুদর্শন। সুদর্শন আমায় কি করবে? আমিও পাথর ছুঁড়ে তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি।

পরাগল। সুবুদ্ধি রায় বাড়ীতে থাকলে তোমাকে বোধহয় কবর দিত হাওয়াই খাঁ।

ইয়াহিয়া। এই দেখুন, আবার আপনি হাওয়াই খাঁ বলছেন। এ বাঙলা মুল্লুক বড় খারাপ জায়গা আছে। রাস্তায় বেরুলে বদমায়েস ছোঁড়াগুলো পর্য্যন্ত হাওয়াই খাঁ বলে তামাশা করে।

পরাগল। মেয়েটি পালায় নি ত?

ইয়াহিয়া। পালাবে ইয়াহিয়া খাঁর জিম্মা থেকে? মেরে তক্তা বানিয়ে দেব না?

পরাগল। কিছু খেয়েছে?

ইয়াহিয়া। না হুজুর, খালি গোসল করছে। কত করে বললুম, —"ভয় কি তোমার? নবাবসাহেবের নজরে যদি পড়ে যাও, তবে ত মিটেই গেল। না হয়, আমি নিজে তোমায় নিকে করব।" যাঁহাতক এই কথা বলেছি হুজুর, অমনি একটা চ্যালাকাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আমার পিঠে চোরের মার। তলোয়ারখানা পর্য্যন্ত বার করার ফুরসুৎ দিলে না।

পরাগল। ছি-ছি-ছি!

ইয়াহিয়া। শয়তানীকে আমি কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাব। আপনি কিছু বলতে পারবেন না হুজুর। আমি ওর বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব।

পরাগল। সে তুমি পারবে না হাওয়াই খাঁ।

ইয়াহিয়া। আরে দূর। আপনি খালি আমায় বেইজ্জৎ কচ্ছেন।

পরাগল। আমরা রাজধানীতে এসে পড়েছি। মেয়েটিকে সাবধানে নিয়ে এস। খবরদার, যেন পালিয়ে না যায়, তাহলে তোমার মাথাটা হাওয়ায় উড়ে যাবে। হাজার হোক বড়ঘরের মেয়ে, মারধর করো না যেন।

ইয়াহিয়া। ক্ষেপেছেন? কুকুর কামড়েছে বলে আমিও কি তাকে কামড়াব? তা ছাড়া, মেয়েটা দেখতে বেশ। নবাবসাহেব যদি না নেন,—

পরাগল। নিকালো বেয়াদব।

ইয়াহিয়া। [স্বগত] ভেড়ীর বাচ্ছা!

[প্রস্থান।

পরাগল। শয়তান মুসলমানদ্বেষী রাজদ্রোহী সুবুদ্ধি রায়ের প্রাণের চেয়ে প্রিয় এই একমাত্র কন্যা। ঠিকই করেছি। জাঁহাপনার হুকুম, আমি কি করব?

স্বদর্শনের প্রবেশ।

সুদর্শন। পরাগল খাঁ!

পরাগল। কে? মহামান্য রাজকুমার? আদেশ করুন।

সুদর্শন। আমার ভগ্নী কোথায়? আমার ভগ্নী?

পরাগল। ভয় নেই। তোমার ভগ্নী নিরাপদেই আছেন। আমরা তাকে সঙ্গে নিয়ে নবাবসাহেবকে ভেট দিতে যাচ্ছি।

সুদর্শন। এ তোমাদের কি নীতি পরাগল খাঁ? পুরুষে পুরুষে বিরোধ, তার মধ্যে মেয়েদের টেনে নিয়ে আসবে?

পরাগল। মাথাটা যখন পেলাম না, তখন কাণটাকেই টেনে নিয়ে যাই, দেখি মাথা আসে কিনা।

সুদর্শন। আমি ত এসেছি। তুমি আমাকে বন্দী করে নিয়ে যাও। তোমাদের নবাব ইচ্ছা হয় আমায় মৃত্যুদণ্ড দেবেন।

পরাগল। তোমার মৃত্যুতে তোমার পিতার নিঃশ্বাসও পড়বে না। আমরা তার মেরুদণ্ড চিরদিনের জন্যে ভেঙ্গে দেব। এই ব্যক্তি বরাবর মুসলমানের বুকে মই দিয়েছে। সব আমরা সহ্য করেছি। কিন্তু আমাদের প্রাপ্য খাজনা সে বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দিয়েছে, এ অপরাধের ক্ষমা নেই।

সুদর্শন। খাজনা যদি আমি দিই—?

পরাগল। বড় দেরী হয়ে গেছে বন্ধু। যা বলতে হয়, জাঁহাপনাকে বল্‌বে চল।

সুদর্শন। পরাগল খাঁ, তুমি ত মানুষ। ভেবে দেখ, একটা অবলা নারীকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে তোমার কৃতিত্ব এতটুকু বাড়বে না। তোমার নবাবের সম্মুখে আমার ভগ্নীকে হাজির করলে তার দুর্গতির সীমা থাকবে না। তারপর তার মৃত্যু ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

পরাগল। আমাকে এ সব কথা বলা নিষ্ফল। যত পার, তুমি জাঁহাপনার কাছে আরজ কর। তিনি যদি আদেশ দেন, যে পথ দিয়ে রাজকুমারীকে নিয়ে এসেছি, সেই পথ দিয়ে আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসব।

[প্রস্থান।

সুদর্শন। কোথায় কুসুম? না—না, এ আমি হতে দেব না। নবাবের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করব। দেখি, আমাদের ক্রীতদাস আলাউদ্দিন কেমন করে তার প্রভুকন্যার ছায়া স্পর্শ করে।

[প্রস্থান।

কুসুমের প্রবেশ।

কুসুম। ওই ত গৌড়ের রাজধানী। ওইখানে পাপিষ্ঠ নবাব আমার অপেক্ষায় দিন গুণছে। স্বপ্ন তোমার সফল হবে না নবাব। কুসুম মরবে, তবু কলংকের পংক গায়ে মাখবে না।

ইয়াহিয়ার প্রবেশ।

ইয়াহিয়া। ইস, শালার মেয়েমানুষ ত নয়, আশমানের হুরী।

কুসুম। আবার তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ? তোমার কি লজ্জা-শরম নেই?

ইয়াহিয়া। আছে। তাবলে তোমার কাছে আমার লজ্জা-শরম নেই। তুমি আমায় মেরেছ বলে আমি কিছু মনে করি নি পিয়ারি। মেয়েমানুষের মার খুব বেশী খারাপ লাগে না। কথাটা কি বলছিলাম জান ?

কুসুম। কি কথা ?

ইয়াহিয়া। কথাটা হচ্ছে, আমরা ত রাজধানীতে এসে পড়েছি। এই হয়ত আমাদের শেষ দেখা। নবাব তোমায় দেখলে আর কি ছেড়ে দেবে ? সঙ্গে সঙ্গে তোমায় নিকে করে ফেলবে।

কুসুম। তাই বটে !

ইয়াহিয়া। এমন একটা চিজ শালা বাঙালী নবাব ভোগদখল করবে, এ আমার বরদাস্ত হচ্ছে না। এখনও সময় আছে, তুমি যদি রাজী হও, আমি তোমায় নিয়ে আব্বাস মিঞার আস্তানায় চলে যেতে পারি। সেখানে মাইরী বলছি, আমি যদি তোমায় নিকে না করি, তুমি আমায় কুকুর বলে ডেকো।

কুসুম। কুকুর বলে এখনই ডাকছি।

ইয়াহিয়া। তুমি বিশ্বাস কচ্চ না কেন ? ইয়াহিয়া খাঁ যা বলে তা কখনও মিথ্যে হয় না।

কুসুম। তফাৎ যাও শয়তান।

ইয়াহিয়া। তুমি চলে এস। [হাত ধরিল]

কুসুম। ছাড়, ছাড় বলছি। তোমার মত নরপশুর সঙ্গে আমি আর এক পা-ও চলব না।

ইয়াহিয়া। তুই চলবি না, তোর বাবা চলবে। শালার মেয়ে-মানুষ ভাঙবে, তবু মচকাবে না। [বস্ত্র আকর্ষণ]

সহসা হোসেন শা'র প্রবেশ ও ইয়াহিয়াকে কশাঘাত।

ইয়াহিয়া। আঃ—কোন হারামীর বাচ্চা রে?

হোসেন। [কাণ ধরিয়া মুখ ফিরাইলেন] চেন আমাকে?

ইয়াহিয়া। ন—ন—নবাবসাহেব! দেখুন, এই মাগী—

হোসেন। [ইয়াহিয়াকে চপেটাঘাত] দীনমহম্মদ,—

পার্শ্বরক্ষীর প্রবেশ।

পার্শ্বরক্ষী। জাঁহাপনা!

হোসেন। এই কুকুরটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে আগুন ধরিয়ে দাও। এর শোচনীয় মৃত্যু দেখে সবাই শিক্ষা করুক যে অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করলে মৃত্যু দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

ইয়াহিয়া। জাঁ—জাঁ—জাঁহাপনা,—

[পার্শ্বরক্ষী তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।]

হোসেন। মুখ ফিরিয়ে রইলে কেন? পরাগল খাঁ তোমাকেই নিয়ে এসেছে? কথা কও। আমি বাঘ-ভাল্লুক নই, নবাব হোসেন শা'।

কুসুম। ধিক্ তোমাকে শয়তান। বাঙলার দণ্ডমুণ্ডের মালিক তুমি, তোমার এই নীচতা! তাহলে মুজাঃফর শা'র সঙ্গে তোমার কতটুকু প্রভেদ? কেন তার হাত থেকে তুমি রাজ্যরশ্মি ছিনিয়ে নিয়েছিলে? তোমার প্রাপ্য রাজকর আমার পিতা যদি আর কাউকে দিয়ে থাকেন, সে জন্যে কি তাঁর কন্যা অপরাধী?

হোসেন। কে তোমার পিতা?

কুসুম। আমার পিতা সুবুদ্ধি রায়।

হোসেন। সুবুদ্ধি রায়!!! তুমি রাজকুমারী কুসুম!

কুসুম। হ্যাঁ শাহানশা।

হোসেন। বীরবলের বিধবা পত্নী তুমি!

কুসুম। মুখের দিকে চেয়ে আছ যে? বাঙলার নবাব তুমি, তোমার জন্যে এ দেশে কি রূপসী নারীর অভাব ছিল? মুজাঃফর শা'র একশো বেগম ছিল, তুমি এক হাজার বেগম এনে নরক গুলজার করলেও ত কেউ বাধা দিত না। এই বিধবা হিন্দু নারীর রূপ এতই কি তোমার কাছে লোভনীয়?

হোসেন। রাজকুমারি, আমার মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখ। সত্যই কি এ মুখে রূপলালসার ছাপ দেখতে পাচ্ছ?

কুসুম। চুপ কর ভণ্ড। কেন আমাকে ধরে আনতে হুকুম দিয়েছ তুমি? আমার জন্যেই কি তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করেছ?

হোসেন। তুমি ভুল বুঝেছ। তোমার স্বামীকে আমি হত্যা করতে চাই নি, চেয়েছিলাম,—

কুসুম। তার সহধর্মিণীকে। কি ভেবেছ তুমি হোসেন শা'? আমি নারী হলেও অবলা নই। এগিয়ে এস শয়তান, এগিয়ে এস। আমার অঙ্গ স্পর্শ করার আগে আমি তোমার ভবলীলা শেষ করব।

হোসেন। তাই কর বহিন, তাই কর। এই আমি বুক পেতে দাঁড়িয়েছি। এখানে আর কেউ নেই। এই পাঞ্জা রইল। তোমার স্বামীর হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে এই পাঞ্জা সঙ্গে করে তুমি আমার মৃতদেহ মাড়িয়ে চলে যাও। কেউ তোমার গতিরোধ করবে না বহিন।

কুসুম। কে তুমি? এ কণ্ঠস্বর কার? কার এই বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো? তুমি কে?

হোসেন। আমি তোমার ভাইজান আলাউদ্দিন।

কুসুম। আলাউদ্দিন! তুমিই বাঙলার ভাগ্যবিধাতা হোসেন শা? আমার পিতার অনুপস্থিতিতে আমাকে জোর করে নিয়ে আসার আদেশ তোমার?

হোসেন। আমারই বহিন। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, আমার সম্মুখে কোন নারীকে আমি দেখতে চাই নি; তোমার কথা আমি কল্পনাও করি নি।

কুসুম। এ তুমি কি করলে নির্ব্বোধ? হিন্দুর মেয়ে আমি, নবাবের রাজপ্রাসাদে আমায় ধরে নিয়ে এসেছ। যমালয় ছাড়া আর আমার যাবার স্থান নেই।

হোসেন। কেন নেই দিদি? আমি নিজে সঙ্গে করে তোমায় পিত্রালয়ে রেখে আসব; তোমার পিতার পায়ে ধরে বলব,—যত কসুর আমিই করেছি, আমার বহিনের কোন দোষ নেই। এস দিদি, এস। দুঃখ করো না, চোখের জল ফেলো না। ভগ্নী এসেছে ভাইয়ের রাজ্যে, মনিব এসেছে ভৃত্যের কাছে। এতে যদি লজ্জার কারণ থাকে, সে লজ্জা তোমার নয়, আমার।

[কুসুমকে লইয়া প্রস্থান।

—:o:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সুবুদ্ধি রায়ের প্রাসাদ।

সুবুদ্ধি রায় ও শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। এতদিন পরে ঘরে ফেরবার সময় হল তোমার? মহালের বিদ্রোহ দমন করতে তোমার নিজেরই যেতে হল? দেওয়ানজি কি এ সামান্য কাজটা করতে পারত না?

সুবুদ্ধি। দেওয়ানজি বেঁচে আছে? কই, সাড়াশব্দ পাচ্ছি না ত?

শঙ্করী। কি করে পাবে? সবাই গা ঢাকা দিয়েছে, দু-চারজন দাসদাসীকে নিয়ে আমি শুধু বাড়ীটা আগলে বসে আছি। ছেলেটা সেই যে গেছে, আজও ফিরল না। তারই বা কি হয়েছে, কে জানে?

সুবুদ্ধি। ব্যাপার কি? কোথায় গেছে সুদর্শন? তোমার চোখে জল কেন?

শঙ্করী। পথে আসতে আসতে কিছুই কি শোন নি তুমি?

সুবুদ্ধি। কই, না। যার সঙ্গে দেখা হয়েছে, সেই মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে। আমার সাড়া পেয়ে মেয়েটাও ত কাছে ছুটে এল না?

শঙ্করী। হাজারবার আমরা তোমাকে বলেছি, নবাবের সঙ্গে লাগতে যেও না। তুমি আমাদের কথা কাণেই তুললে না। নবাবের পাওনা সাতবছরের খাজনা পর্য্যন্ত তুমি আর একজনকে দিয়ে দিলে।

সুবুদ্ধি। বেশ করেছি। নবাব! কে এই নবাব জান? আমাদের সেই ক্রীতদাস আলাউদ্দিন।

শঙ্করী। আলাউদ্দিন নবাব! ওগো, তুমি বলছ কি? আলা-উদ্দিন হয়েছে নবাব, আর তার খাজনা তুমি বন্ধ করে দিলে? তোমার ছেলে যদি নবাব হত, আনন্দে কি তোমার বুকটা দশহাত ফুলে উঠত না?

সুবুদ্ধি। ছেলে আর নফর এক নয়।

শঙ্করী। সাত বছর সে কোন কথা বলে নি। তার পাওনা তুমি অপরকে দিলে সে সহ্য করবে কেন? বেশ করেছ। ছেলেটা হয়ত আর ফিরবে না। আমাকেও তুমি খুন কর। এ জ্বালা আর আমি সইতে পাচ্ছি না।

সুবুদ্ধি। অনেক ভণিতা করেছ। এবার কি হয়েছে তাই বল। সুদর্শন কোথায়? কুসুম কোথায়?

শঙ্করী। নিয়ে গেছে মহারাজ, কুসুমকে নিয়ে গেছে।

সুবুদ্ধি। নিয়ে গেছে! কে নিয়ে গেছে?

শঙ্করী। ওই পরাগল খাঁ।

সুবুদ্ধি। পরাগল খাঁ! সৈন্য-সামন্ত পাইক বরকন্দাজ সবাই কি মরেছিল? সুদর্শন কি ঘুমিয়েছিল?

শঙ্করী। ঘুমুবে কেন? ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে নি। শয়তানী মেয়েটা কোন্ ফাঁকে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। তাকে শিবিকায় তুলে নিয়ে গেল, আর ছেলেটা কাটা মাথা নিয়ে তার পিছে পিছে ছুটে গেল।

সুবুদ্ধি। ওঃ—সুবুদ্ধি রায়ের মেয়েকে নিয়ে যায় নবাবের অনুচর। যে নবাব একদিন তার পায়ের কাঁটা দাঁত দিয়ে তুলে দিত। বাপ হয়ে কত অনুনয় করেছি, কিছুতেই সে কথা শুনলে না। আবার যদি সে বিবাহ করত, কেউ তার ছায়া স্পর্শ করতেও সাহস করত

না। বিধবা যুবতী কন্যা বাপের বাড়ীতে থাকলে তার চারিদিকে কামান্ধ পশুর দল লোলুপ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। এ ত জানাই ছিল। তাই বলে আমারই ক্রীতদাস আমার কন্যাকে,—ওঃ!

শঙ্করী। মহারাজ!

সুবুদ্ধি। না—না, ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। তাকে আর ফিরে পাব না; পেলেও দলিত কুসুম আর ঠাকুরঘরে স্থান পাবে না। তাই বলে এ আমি নীরবে সহ্য করব না। আমি যাচ্ছি রাণি।

সুদর্শনের প্রবেশ।

সুদর্শন। যেতে হবে না পিতা। কুসুম ফিরে আসছে।

শঙ্করী। কই রে সুদর্শন, কোথায় সে অভাগা মেয়েটা? একাদশীর পরদিন সবে ভাতের থালা নিয়ে বসেছিল, এমনি সময় শয়তানগুলো এসে বাড়ীতে হানা দিলে। তারপর থেকে নিশ্চয়ই মেয়েটা উপবাসী। ওগো, ও বামুন ঠাকরুণ, শীগ্‌গির আলোচালের ভাত চড়িয়ে দাও। ওরে, ও সুদর্শন, শুনেছিস, নবাব নাকি আমাদের সেই মুখপোড়া আলাউদ্দিন। পরাগল খাঁ নিশ্চয়ই তার অজান্তে কুসুমকে নিয়ে গিয়েছিল।

সুদর্শন। আমারও তাই বিশ্বাস।

শঙ্করী। কই রে সুদর্শন, মেয়েটা কই? আয়—আয়, এগিয়ে নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

সুবুদ্ধি। যাও সুদর্শন, মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। চিঠি আছেন মহারাজ।

সুদর্শন। কে লিখেছে?

ভৃত্য। গুরুঠাকুর। [চিঠি দিল] বাবা, সে কি চোখ। মনে হল ভস্ম করে ফেলবে বুঝি। আমি চিঠি নিয়ে দে ছুট। [স্বগতঃ] হাত্তোর গুরুর নিকুচি করেছে।

[প্রস্থান।

সুবুদ্ধি। [পত্র পড়িলেন; কম্পিত হাত হইতে চিঠি পড়িয়া গেল।]

সুদর্শন। কি হল পিতা? কি লিখেছেন গুরুদেব?

সুবুদ্ধি। পড়ে দেখ।

সুদর্শন। [পত্র পড়িয়া] পিতা!

সুবুদ্ধি। তোরণদ্বার বন্ধ করে দাও। এ রাজগুরুর আদেশ, সমাজের বিধান।

সুদর্শন। এ আপনি কি বলছেন?

সুবুদ্ধি। দস্যুতে যাকে টেনে নিয়ে গেছে, হিন্দুর ঘরে আর তার স্থান হতে পারে না সুদর্শন।

সুদর্শন। কিন্তু তার ত কোন অপরাধ নেই।

সুবুদ্ধি। তা জানি। আর এও জানি, কুসুম প্রাণ দেবে, তবু ধর্ম্ম দেবে না। কিন্তু সমাজ একথা বুঝবে না। শাস্ত্রী, শিরোমণি, বিদ্যানিধির দল শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমাদের ঘরের দিকে। অনুশাসনের এতবড় একটা সুযোগ তারা ত্যাগ করবে না। নিষ্কলঙ্ক জেনেও তাকে আমাদের ঘরে তুলে নেওয়া চলবে না। এ তারও দুর্ভাগ্য, আমাদেরও দুর্ভাগ্য।

সুদর্শন। মানুষের চেয়ে সমাজের দাম কি এতই বেশী?

সুবুদ্ধি। হ্যাঁ সুদর্শন। এই সমাজের ভয়ে রামচন্দ্রকেও পত্নীত্যাগ

করতে হয়েছিল। আমরা ত সাধারণ মানুষ। আমি যাচ্ছি নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তুমি তোরণদ্বার বন্ধ করে দাও। চোখে আমারও জল আসছে পুত্র। কিন্তু এ ছাড়া আর কোন পথ নেই, কোন পথ নেই।

কুসুমের প্রবেশ।

কুসুম। মা—মা, আমি এসেছি মা।

সুবুদ্ধি। দাঁড়াও।

কুসুম। বাবা এসেছ? পথ আগলে দাঁড়ালে কেন? কি বলছ বাবা?

সুবুদ্ধি। কার সঙ্গে এসেছ তুমি?

কুসুম। নবাব নিজেই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

সুবুদ্ধি। নবাবের কাছেই তুমি ফিরে যাও কন্যা।

হোসেনের প্রবেশ। পরিধানে ভৃত্যের পোষাক।

হোসেন। ভাইয়ের ঘরে ভগ্নীর অবারিত দ্বার। যদি সম্ভব হত, আমার ভাগ্যবিড়ম্বিতা ভগ্নীকে নিয়ে গিয়ে আমি মাথায় করে রাখতুম। কিন্তু ভায়ের উচ্ছিষ্ট ফল খেলে যার জাত যায়, ভাইয়ের ঘরে তার স্থান কি হতে পারে বাবাঠাকুর? ধর্ম্ম রসাতলে যাবে, চতুর্দ্দশ পুরুষ স্বর্গ থেকে নরকে নেমে আসবে। তাই না ভাইজান?

সুদর্শন। মহামান্য নবাব,—

হোসেন। এই দেখ, রাজভক্তির বান ডেকে উঠল। নবাব হয়ে ত আমি আসি নি ভাইজান। চেয়ে দেখ, এ তোমাদের সেই নফর আলাউদ্দিন। এই আপনার সেই চাবুক বাবাঠাকুর। এই সে

পিঠের চাবুকের ঘা, যা আমার জীবনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছে। [রাজার পায়ে চাবুক রাখিলেন] যাও দিদি, ভেতরে যাও, মা-ঠাকরুণকে খবর দাও। আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে। মা-ঠাকরুণ আমায় খেতে দেবে না?

কুসুম। যাচ্ছি ভাইজান।

সুবুদ্ধি। না মা, না; ওরে তুই ফিরে যা।

কুসুম। }
সুদর্শন। } বাবা!

সুবুদ্ধি। এ ঘর আর তোমার ঘর নয় কুসুম।

হোসেন। সমাজের বিধান বুঝি? মুসলমানের এলাকায় পা দিয়েছে বলে? সমাজপতিদের ডাকুন, আমি তাদের বুঝিয়ে বলব, কোরাণ স্পর্শ করে বলব, দোষ যদি করে থাকি, আমিই করেছি, আমার বহিনের কোন দোষ নেই।

সুবুদ্ধি। এই তুমি বাঙলার বন্ধু? যাকে তুমি একদিন বিনা অপরাধে হত্যা করেছ, তারই বিধবা পত্নীর ধর্ম্মনাশ করতে হাত বাড়িয়েছ পশু? [হোসেন কাণে হাত দিলেন] আর সে অভাগিনী সুবুদ্ধি রায়ের কন্যা, যে সুবুদ্ধি রায় তোমাকে পনের বছর বুকের রক্ত খাইয়ে প্রতিপালন করেছিল

হোসেন। আমার দুর্ভাগ্য বাবাঠাকুর, যে আমারই অনুচরেরা আপনার কন্যাকে আমার রাজধানীতে নিয়ে গিয়েছিল। আমার জানা ছিল না যে আমার প্রাপ্য রাজকর যে শাহজাদা মজিদকে দান করেছেন, তাঁর নাম সুবুদ্ধি রায়। আপনি করেছেন রাজদ্রোহ, আমি করেছি ভুল। আপনার রাজদ্রোহ চিরদিনের জন্য আমি শুদ্ধ করে দেব। আপনার জায়গীর সাতবছর আগে থেকে নিষ্কর।

সুদর্শন। } বঙ্গেশ্বরের জয় হক।
কুসুম। }

হোসেন। আর আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি নিজেই বহিনকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। সমাজ যদি অঙ্গুলিহেলন করে, অর্থ দেব—হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকা দেব, রাজকোষ উজোড় করে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করব।

সুবুদ্ধি। ভাল করে প্রায়শ্চিত্ত কর। তুমি নবাব, তুমি বাঙলার দণ্ডমুণ্ডের মালিক, কিন্তু আমি জায়গীরদার সুবুদ্ধি রায়, আমার ঘরের আমিই প্রভু। আমার বংশের সুনাম যে ক্ষুণ্ণ করেছে, তার শাস্তি এই কশাঘাত। [হোসেনের চাবুক দিয়া হোসেনকে প্রহার]

সুদর্শন। } বাবা,—
কুসুম। }

ছুটিয়া শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। ওগো, এ তুমি কি কচ্ছ? [চাবুক কাড়িয়া লইয়া ফেলিয়া দিলেন]

হোসেন। আমি গোঁসা করি নি বাবাঠাকুর, আমি গোঁসা করি নি। কেউ দেখতে পায় নি, কেউ কোনদিন জানবে না। মেরেছ, আরও মার। তবুও আমার দিদিকে তুমি ঘরে নাও, আমার দোষে আমার বহিনকে নিরাশ্রয় করো না বাবাঠাকুর। [প্রস্থানোদ্যোগ]

শঙ্করী। আলাউদ্দিন!

হোসেন। বড় ক্ষিদে পেয়েছিল মা-ঠাকরুণ। আর আমার ক্ষিদে নেই। দিদিকে ঘরে নিয়ে যাও, তিনদিন দানাপানি মুখে দেয় নি। আদাব—আদাব। [প্রস্থান।

কুসুম। এ কি করলে তুমি বাবা?

শঙ্করী। নবাবকে তুমি চাবুক মারলে?

সুদর্শন। পিতা, ধর্ম্ম ভাল, কিন্তু ধর্ম্মান্ধতা ভাল নয়। যাও মা, কুসুমকে খেতে দাও গে।

সুবুদ্ধি। কথা শুনতে পাচ্ছ না নির্ব্বোধ? সমাজ ওকে আর ঠাঁই দেবে না।

শঙ্করী। এ তুমি বলছ কি? কোথায় যাবে ও অভাগা মেয়ে?

সুবুদ্ধি। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা কর, সমাজকে জিজ্ঞাসা কর।

কুসুম। বাবা!

সুবুদ্ধি। এ শাস্তি তোর নয় মা, আমার। তোর নিরুপায় পিতাকে অভিশাপ দিতে দিতে তুই কাশীধামে চলে যা। সোনার অট্টালিকা গড়িয়ে দিয়ে এস সুদর্শন। যত অর্থ চাই, নিয়ে যাও।

সুদর্শন। অর্থ চাই না পিতা। পিতা হয়ে আপনি যাকে আশ্রয় দিতে পারলেন না, ভাই হয়ে আমি তাকে আশ্রয় দেব। পর্ণকুটিরে বাস করে ভিক্ষান্নে জীবন-যাপন করব, তবু প্রাসাদে আর প্রবেশ করব না। যে সমাজের ভয়ে নিজের নিরাপরাধা কন্যাকে আপনি ত্যাগ করলেন, সে সমাজই যেন আপনার কাল হয়।

শঙ্করী। ওগো, এখনও কথা শোন। মেয়েটার মুখের দিকে চাও। দেখ, মুখখানা শুকিয়ে গেছে।

সুবুদ্ধি। তুমি আর কতটুকু দেখছ রাণি? আমি দেখছি অনেক বেশী। উপায় নেই। শকুনগুলো সহস্র চোখ মেলে চেয়ে আছে। ওরা জানবার আগেই তুমি ওকে নিয়ে যাও সুদর্শন। ওকে যেন কেউ কটু কথা বলার সুযোগ না পায়।

কুসুম। অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটা রাতও কি আমায় থাকতে দেবে না বাবা?

সুবুদ্ধি। উপায় নেই মা।

কুসুম। তবে আসি বাবা। মনে করো, তোমার ছেলে-মেয়ে মরে গেছে। কিন্তু কোথায় যাব দাদা?

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণবের প্রবেশ।

বৈষ্ণব। গীত।

আয় রে তোরা আয়।
কোন উদাসীর বাঁশের বাঁশী আবার ডেকে যায়।
নূপুরধ্বনি আসছে ভেসে,
মাভৈঃ মাভৈঃ এসেছে সে,
না জানি কোন পুণ্যভূমে, কোন্ রসিকের আঙিনায়।
দুঃখী যারা সর্ব্বহারা,
শুকায় না যার নয়নধারা,
তাদের সবার ত্রাণের লাগি নামল ত্রাতা এই ধরায়।

বৈষ্ণব। ওরে আয়, কে আছিস পতিত নিপীড়িত ধরণীর সর্ব্বহারা সন্তান,—তোদের উদ্ধারের জন্যে আবার এসেছে সেই বিরাট পুরুষ, যে বলে গিয়েছিল, ধর্ম্মের গ্লানি হলে যুগে যুগে আমি আসব। আমি তা'র পদধ্বনি শুনেছি। আয়—আয়, খুঁজে দেখি, কোথায় জন্ম নিয়েছে সেই অশরণের শরণ।

[সুদর্শন কুসুমের হাত ধরিল, বৈষ্ণব সুদর্শনের হাত ধরিল।]

শঙ্করী। দাঁড়া মা, আমিও তোদের সঙ্গে যাব।

[কুসুমের অঞ্চল ধরিল, অঞ্চল ছাড়াইয়া কুসুম, সুদর্শন বৈষ্ণবের সহিত চলিয়া গেল। শঙ্করী পড়িয়া গেলেন।]

সুবুদ্ধি। রাণি,—

শঙ্করী। ওগো, দেখ—দেখ, কে যেন পালিয়ে যাচ্ছে।

সুবুদ্ধি। আমি ওকে চিনি, ওর নাম শান্তি। যেতে দাও, সবাইকে যেতে দাও। পুত্রকন্যা সব বটের ছায়া, এই আছে, এই নেই।

[শঙ্করীর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

—:•:—

তৃতীয় দৃশ্য।

আদিনা-মহল।

চাঁদ কাজী ও আদিনার প্রবেশ।

আদিনা। তুমি বল কি বাপজান? তোমার জামাই সুবুদ্ধি রায়ের ক্রীতদাস ছিল? তুমি আমায় ক্রীতদাসের সঙ্গে সাদি দিয়েছ?

চাঁদ কাজী। আফশোষ করো না কন্যা। ক্রীতদাসত্ব ওর নিজের অপরাধ নয়। সৈয়দ বংশে ওর জন্ম, বাঙলায় এ বংশের ছেলে লাখে একটি মেলে।

আদিনা। তাই বলে ক্রীতদাস,—

চাঁদ কাজী। কি তুমি বারবার ক্রীতদাস ক্রীতদাস কচ্ছ? বাদশা কুতুবউদ্দিনও ক্রীতদাস ছিলেন। এ এক অসাধারণ প্রতিভা। আমি ওকে নিয়ে এসে নবাবের সৈন্যদলে সামান্য একটা হাবিলদারের পদে বহাল করিয়ে দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ মৌলবীর

কাছে ওর অধ্যয়ন চলতে লাগল। পাঁচ বছর পরে হাবিলদার হল তিনহাজারী মনসবদার, আর মৌলবীর সমস্ত বিদ্যা সে আয়ত্ত করে নিলে। তুমিই ত তখন ধনুকভাঙ্গা পণ করলে যে তাকে ছাড়া আর কাউকে সাদি করবে না।

আদিনা। তুমি ত আমায় বল নি, একটা হিন্দুর ক্রীত—

চাঁদ কাজী। আবার ক্রীত! তুমি অত্যন্ত মুখরা। এইজন্যেই হোসেনকে তুমি ঠিক ঘরবাসী করতে পার নি। এত বড় একটা প্রতিভা বিপথে চালিত হয়ে মুসলমান সমাজের চক্ষুশূল হয়ে রইল।

আদিনা। তোমার যে বোঝবার ভুল হয়েছিল বাপজান। পনের বছর যে হিন্দুর দানাপানি খেয়েছে, হিন্দুর পূজোর প্রসাদ খেয়েছে, হিন্দুর পায়ের কাঁটা দাঁত দিয়ে তুলে নিয়েছে, সে কি আর কখনও নামাজ পড়তে পারে? তুমি ওক নিয়ে এলে কেন?

চাঁদ কাজী। দেখলাম ওর দুর্জ্জয় সাহস, সুন্দর সুগঠিত দেহ আর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। আরও দেখলাম, সামান্য কারণে সুবুদ্ধি রায় ওর পিঠে চাবুক মাচ্ছে। তাই ওকে নিয়ে এলাম। হিসাবে আমি ভুল করি নি। সেই অবহেলিত ক্রীতদাস আজ বাঙলার মহামান্য নবাব।

আদিনা। তাই বুঝি সুবুদ্ধি রায়ের জায়গীর নিষ্কর?

চাঁদ কাজী। নিষ্কর ছিল না। তার সাত বছরের খাজনা বাকী পড়েছিল। সে খাজনা সে নবাবকে দেয় নি, দিয়েছিল শাহজাদা মজিদ খাঁকে।

আদিনা। ও হরি!

চাঁদ কাজী। হরি উচ্ছন্ন যাক। কথাটা শুনে পরাগল খাঁ হোসেনকে বললে,—কোন জায়গীরদার যদি আমাদের প্রাপ্য রাজকর

শাহজাদাকে দিয়ে থাকে, কি তার শাস্তি? নবাব হুকুম দিলে, তার সব চেয়ে প্রিয় যে, তাকে ধরে নিয়ে এস, আমি তার দেহ দ্বিখণ্ডিত করে জায়গীরদারকে খাজনার দাখিলা পাঠিয়ে দেব।

আদিনা। কই, এ কথা ত আর শুনি নি।

চাঁদ কাজী। আমিও আজই শুনেছি।

আদিনা। তারপর কি হল?

তালপাত সিংয়ের প্রবেশ।

তালপাত। তারপর কি শোন নি? বীরবর পরাগল খাঁ সুবুদ্ধি রায়কে না পেয়ে আর তার ছেলের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে বিধবা রাজকন্যাকে নিয়ে এসে জাঁহাপনাকে সওগাৎ দিলে।

আদিনা। সে কি!

চাঁদ কাজী। কোথায় সে মেয়েটি?

তালপাত। নবাব হোসেন শা এমন অরসিক যে মেয়েটার হাতখানাও একটিবার ধ'রলে না। বরং তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সুবুদ্ধি রায়ের কাছে গিয়ে ব'ললে,—"এই নাও বাবাঠাকুর তোমার মেয়ে। সব আমার দোষ, বহিনের কোন দোষ নেই।

চাঁদ কাজী। শুনছ আদিনা?

আদিনা। শুনছি আর রাগে অন্ধকার দেখছি।

তালপাত। আমি দূর থেকে পিছু নিলাম। নবাবের সে কি হাল বেগমসাহেবা। দেখে আমার চোখ ফেটে জল এল। খালি পা, গায়ে একটা ময়লা তালি দেওয়া জামা।

আদিনা। লোকটা এতও জানে।

তালপাত। তোমার যে খুশীর সীমা নেই।

আদিনা। খুশী মুখপোড়া? আমার মরতে ইচ্ছে হচ্ছে। ও বাপজান,—

চাঁদ কাজী। সুবুদ্ধি রায় খাজনা দিয়েছে কি না শোন।

তালপাত। খাজনা দিয়েছে বইকি? তবে টাকায় নয়, চাবুকের ঘা'য়ে।

আদিনা। চাবুক!

তালপাত। চাবুক খেয়েই জাঁহাপনা তার জায়গীর নিষ্কর করে দিয়েছে।

আদিনা। এসব কবে হল?

চাঁদ কাজী। তিন-চার বছর আগে।

আদিনা। এতদিন এ কথা বলিস নি কেন?

তালপাত। জাঁহাপনার নিষেধ ছিল। আজ তার গায়ে হেকিমী ওষুধ মালিশ করতে গিয়ে দেখলুম, সেই চাবুকের দাগ এখনও মিলিয়ে যায় নি। দেখে আমার চোখ ফেটে আগুন বেরিয়ে এল, তাই ছুটে এলুম তোমার কাছে বেগমসাহেবা। যদি তুমি বাপের বেটি হও, সুবুদ্ধি রায়কে ভাল করে বুঝিয়ে দাও যে নবাবের গায়ে কাঁটার আঁচড় দিলেও মাথা দিয়ে প্রাচিত্তির করতে হয়।

[প্রস্থান।

চাঁদ কাজী। একে এই অপমান, তার ওপর এত বড় একটা জায়গীর নিষ্কর! এও কি সম্ভব?

আদিনা। মিছে কথা বাপজান। ও গাঁজায় দম দিয়েছে।

চাঁদ কাজী। সুবুদ্ধি রায়কে তুমি চেন না। নবাবী খাজনা যে বন্ধ করতে পারে, তার অসাধ্য কিছুই নেই।

আদিনা। ধর্ম্মে সইবে না।

চাঁদ কাজী। রাখ তোমার ধর্ম্ম। তোমার রাগ হচ্ছে না?

আদিনা। ভীষণ রাগ হচ্ছে, বললুম ত। তবে তিন-চার বছর আগের কথা ত। রাগটা ভাল জমছে না।

চাঁদ কাজী। আমরা এর যোগ্য প্রতিশোধ নেব।

আদিনা। প্রতিশোধের গোড়া কেটে দিয়েছে যে। শুনলে না, সুবুদ্ধি রায়ের জায়গীর নিষ্কর করে দিয়েছে? নিষ্কর জায়গীরদারের উপর কোন অছিলায় হামলা করবে?

চাঁদ কাজী। অছিলা একটা খুঁজে নিতে হবে।

আদিনা। তার চেয়ে কাটা কাণ চুল দিয়ে ঢেকে সব চেপে যাও বাপজান। এতদিন আমরা যা শুনি নি, আজ আমরা তা শুনেও শুনব না।

চাঁদ কাজী। তুমি অতি অপদার্থ। তুমি যদি রাশ টেনে ধরতে, তাহলে হোসেনের এত বুদ্ধিভ্রংশ হতে পারত না। শাহজাদা মজিদকে তুমিই মুক্ত করে দিয়েছ।

আদিনা। নইলে নবাবের সত্যভঙ্গ হত যে।

চাঁদ কাজী। 'সত্যভঙ্গ'! রাজনীতির মধ্যে ওসব ভাবপ্রবণতা চলে না।

আদিনা। নবাবের কাছে যে শুনেছি, সত্যের জন্যে কে এক মুখপোড়া হরিশ্চন্দ্র ছেলে-বৌকে বেচে দিয়ে দেনা শোধ করেছিল। তাছাড়া, শাহজাদার গর্দ্দান নিলে মোল্লারা চটে আগুন হয়ে যেত।

চাঁদ কাজী। এখন কি তারা জল হয়ে গেছে? আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না। সুবুদ্ধি রায় মরবে।

আদিনা। তাহলে তুমিও বাঁচবে না বাপজান। নবাব নিজে

যে অপমান চার বছর মুখ বুজে সহ্য করে আছেন, অপরের তা নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল।

চাঁদ কাজী। তার মাথাটাকে তুমিই বিগড়ে দিয়েছ। মস্তিষ্ক বিকৃত না হলে একটা জায়গীরদারের কশাঘাত সে পিঠ পেতে নেয়?

আদিনা। মনিব কিনা, বুঝলে না বাপজান? আজ যে চাবুক মেরেছে, একদিন পেটের ভাত সেই জুগিয়েছিল। তার জাতভাইয়েরা জোগায় নি, চাঁদ কাজীও নয়।

[প্রস্থান।

চাঁদ কাজী। সংসর্গের দোষে মেয়েটাও উচ্ছন্ন গেছে। থাকবে না, এ রাজত্ব থাকবে না। আবার বাঙলাদেশে হিন্দুর জমানা হাসিল হবে। জ্যোতিষীর কথা এর মধ্যেই ফলতে শুরু করেছে। নবদ্বীপ থেকে হরিনামের বন্যা আজ তামাম বাঙলাদেশটাকে এসে গ্রাস কচ্ছে। ওই আসছে বন্যার স্রোত। হুঁশিয়ার!

[নেপথ্যে জনৈক বৈষ্ণব গাহিতেছিল।]

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্,
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।"

উত্তেজিত হোসেন শা'র প্রবেশ।

হোসেন। চুপ। "হরিবোল, হরিবোল আর হরিবোল।" হরি এসে তোমাদের স্বর্গে বাতি দেবে। শক, হুণ, মোঙ্গল দস্যুর দল যখন এ দেশের মানুষগুলোকে বলির পশুর মত খুন করেছিল, তখন হরি এসে কজনকে রক্ষা করেছিলেন? গিয়াসউদ্দিন বলবন যখন একদিনে দশহাজার বাঙালীকে রাজপথের দু'ধারে ফাঁসী দিয়েছিল,

তখন ত হরির সুদর্শন চক্র গর্জ্জে ওঠে নি। মুজাঃফর শা যখন বাঙালীর রক্তে নদী বইয়ে দিয়েছিল, তখন ত হরির ঘুম ভাঙে নি। নিকালো মেরুদণ্ডহীন ক্লীবের দল।

চাঁদ কাজী। কাকে কি বলছ হোসেন?

হোসেন। কোথা থেকে এল ওই মুণ্ডিত মস্তক তুলসীর মালা গলায় বাবাজীর দল? ওদের খোল বাজাতে বারণ করে দিন। আবার হরিনাম করলে আমি ওদের বেত্রাঘাত করব।

চাঁদ কাজী। তবু ওরা থামবে না। ওরা এক গালে চড় খেলে আর এক গাল পেতে দেবে। ওরা কি বলে জান? "মেরেছিস কলসীর কাণা, তা বলে কি নাম দেব না?"

হোসেন। দেশটা শাকপাতা খেয়ে আর নামকীর্ত্তন করে রসাতলে যেতে বসেছিল, আমি বহুদিনের সাধনায় তাকে টেনে তুলেছিলাম। আবার এ দুর্ভাগা জাত কীর্ত্তন গেয়ে দেশ উদ্ধার করবে? এ জাত কি কিছুতেই শক্তির সাধনা করবে না? কোথা থেকে এল এই হরিনামের স্রোত?

চাঁদ কাজী। নবদ্বীপ থেকে।

হোসেন। নবদ্বীপ! জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষী এই নবদ্বীপের কথা কি যেন বলেছিলেন?

চাঁদ কাজী। বলছিলেন,—"নবদ্বীপে এমন এক বিরাট পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছে, যার অঙ্গুলিহেলনে সমগ্র দেশ মন্ত্রমুগ্ধের মত চালিত হবে। বাদশা, নবাব, রাজা, মহারাজ তলিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দেশের আসল ভাগ্যবিধাতা হবে সেই।"

হোসেন। কে সেই বিরাট পুরুষ? কি নাম তার?

চাঁদ কাজী। নিমাই পণ্ডিত। ভক্তেরা বলে শ্রীচৈতন্য।

হোসেন। এমন কত ভক্ত আছে তার?

চাঁদ কাজী। লাখ লাখ, লেখাজোখা নেই। মুসলমানেরা পর্য্যন্ত তার বৈষ্ণবধর্ম্মে দলে দলে দীক্ষা নিচ্ছে। কতবার তোমায় সাবধান করেছি, তুমি শুনেও শোন নি। আজ নিমাই নিতাইয়ের নামগানে শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়। এখনও যদি প্রতিরোধ না কর, তাহলে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়বে, ব্যভিচারে দেশ ছেয়ে যাবে।

হোসেন। না—না—না, বাঙলার সর্ব্বনাশ আমি হতে দেব না। মন্ত্রীদের সেলাম দিন জনাব।

চাঁদ কাজী। কোথায় মন্ত্রী? মন্ত্রী রূপসনাতনও মাথা মুড়িয়ে বাবাজীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

হোসেন। রূপসনাতন? কুশাগ্রবুদ্ধি দবীরখাস আর সাকর-মল্লিক! তাইত, বাদশা শ্যেনদৃষ্টিতে সোনার বাঙলার দিকে চেয়ে আছে, কামরূপ, ত্রিপুরা আর যৌনপুর সুযোগের অপেক্ষায় আছে, হাবশী শয়তানেরা আশেপাশে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে। আমার সোনার বাঙলাকে শেয়াল-শকুনের লীলাভূমি হতে আর আমি দেব না।

চাঁদ কাজী। এখনও যদি সাবধান না হও, তাহলে তোমাকেও একদিন বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করতে হবে। হুঁশিয়ার হোসেন শা'।

[প্রস্থান।

হোসেন। নবদ্বীপ হোসেন শা'র ধ্যানের বাঙলাকে কলুষিত করবে? গোটা নবদ্বীপকে আমি ভাগীরথীর জলে ডুবিয়ে দেব।

পুরন্দরের প্রবেশ।

পুরন্দর। জাঁহাপনা, নবদ্বীপ-শান্তিপুরে নিরীহ বৈষ্ণবরা নগর-কীর্ত্তন কচ্ছে, মলয় কাজী তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করেছেন।

হোসেন। খুন করতে বলে দাও।

পুরন্দর। কি বলছেন আপনি?

হোসেন। রূপসনাতন দরবারে আসেন নি?

পুরন্দর। না জাঁহাপনা, তিনদিন তাঁরা অনুপস্থিত। শুনেছি, চাকরি আর তাঁরা করবেন না।

হোসেন। মাথা মুড়িয়ে বৈষ্ণব হয়েছে, না? ভিক্ষে করে উদর পূরণ করবে, আর সেবাদাসী নিয়ে রাসলীলা করবে, কেমন? দু'ভাইকে বেঁধে নিয়ে এস।

পুরন্দর। আর একজন তাঁদের বেঁধে নিয়ে বৃন্দাবনে চালান দিয়েছে জনাব।

হোসেন। আমার মন্ত্রীদের চালান দিলে কে সে শয়তান?

পুরন্দর। তিনি নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য।

হোসেন। নবদ্বীপকে শ্মশানে পরিণত কর। বৈষ্ণবদের ঝাড়ে-মূলে নিঃশেষ করে দাও।

পুরন্দর। বৈষ্ণবেরা ত কারও অনিষ্ট করেনি জনাব।

হোসেন। আজ বুঝবে না মূর্খ, বুঝবে দশ বিশ বছর পরে। যাও, নবদ্বীপ ধ্বংস কর, বৈষ্ণবধর্ম্ম মুছে ফেলে দাও।

পুরন্দর। পরাগল খাঁকে বলুন জাঁহাপনা। এত বড় মহৎ কাজ 'আমি' করতে পারব না।

হোসেন। তোমার শাহানশার হুকুম।

পুরন্দর। শাহানশার হুকুমে আমি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি, তাই বলে কারও ধর্ম্মে আঘাত দিতে পারব না।

হোসেন। এ অবাধ্যতার পরেও তুমি নকরী করতে চাও?

পুরন্দর। না, চাই না। যেদিন পরাগল খাঁকে পাঠিয়ে সুবুদ্ধি

রায়ের বিধবা কন্যাকে আপনি ধ'র নিয়ে এসেছিলেন, সেইদিনই আমার নকরীর সাধ মিটেছে। সৈয়দ হোসেন শার এ মূর্ত্তি আমি কখনও কল্পনা করি নি।

হোসেন। হোসেন শা যে রাজকন্যাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে, সে খবর তুমি রাখ?

পুরন্দর। গাছ কেটে গোড়ায় জল ঢেলে কোন লাভ নেই শাহানশা। সমাজ তাকে গ্রহণ করে নি।

হোসেন। গ্রহণ করে নি? সে তবে কোথায়?

পুরন্দর। সংসারের জনারণ্যে হারিয়ে গেছে।

হোসেন। এ জাত মরবে না ত মরবে কে?

পুরন্দর। জাতির পরিত্রাতা বলে মনে প্রাণে আপনাকে শ্রদ্ধা করেছিলাম। আজ মনে হচ্ছে, মহম্মদ তোগলকের কবর থেকে আপনি উঠে এসেছেন। নবদ্বীপ আপনি ধ্বংস করতে পারেন, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মকে নিশ্চিহ্ন করার সাধ্য দশটা হোসেন শারও নেই।

[প্রস্থান।

হোসেন। কে দেবে পথের নির্দ্দেশ? ফকির সাহেবকেও ত আর দেখতে পাচ্ছি না।

পরাগল খাঁর প্রবেশ।

পরাগল। জাঁহাপনা, আজমীড় শরীফে হজ করতে করতে পুণ্যাত্মা ফকির কুতব-উল-আলম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

হোসেন। কুতব-উল-আলম পরলোকে! হোসেন শা'র পথের দিশারী সেই মহাপুরুষের কম্বুকণ্ঠ নীরব হয়ে গেল পরাগল খাঁ? কেউ থাকবে না। বাংলার চরম দুর্দ্দিনের আগমনী বার্ত্তা শুনে

খাঁটি মানুষগুলো একে একে সবাই চলে যাচ্ছে। পড়ে থাকবে ওই শাকান্নভোজী ব্যভিচারী ন্যাড়া নেড়ীর দল।

পরাগল। সত্য জাঁহাপনা।

হোসেন। পরাগল খাঁ, ফকির সাহেবের বাসভূমি পাণ্ডুয়ায় এক সুদৃশ্য মসজিদ নির্ম্মাণ করে দাও।

চাঁদ কাজীর প্রবেশ।

চাঁদ কাজী। শুধু তাই নয় বাপজান। আদিনাকে নিয়ে তুমি আজই আজমীড় শরীফে রওনা হও। ফকির সাহেবের কবর থেকে তোমরা স্বহস্তে মাটি তুলে এনে পাণ্ডুয়ার সে মসজিদে রক্ষা কর।

পরাগল। আমি মসজিদ নির্ম্মানের ব্যবস্থা কচ্ছি। আপনারা আজই যাত্রা করুন জাঁহাপনা।

হোসেন। তাই যাব। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত রাজ্য-শাসনের ভার আপনার উপর রইল জনাব, তাই না পরাগল খাঁ?

পরাগল। জী শাহান শা।

হোসেন। ওই দেখ, কাতারে কাতারে মুণ্ডিত-মস্তক বাবাজীর দল খোল বাজিয়ে নামকীর্ত্তন করে চলেছে, আর গোটা রাজধানী ভেঙ্গে পড়েছে রাজপথের দুই পার্শ্বে। আমি ফিরে এসে যেন দেখতে পাই, নবদ্বীপ ধ্বংস হয়েছে, বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। [প্রস্থান।

চাঁদ কাজী। আমিও যেন দেখতে পাই, সুবুদ্ধি রায়ের ধর্ম্মের সঙ্গে মান ইজ্জৎ ধূলিসাৎ হয়েছে। [প্রস্থান।

পরাগল। কারও ইচ্ছা অপূর্ণ রাখব না। আমার নাম পরাগল খাঁ। [প্রস্থান।

—:•:—

চতুর্থ দৃশ্য

নবদ্বীপ—রাজপথের পার্শ্বদেশ।

মজিদের প্রবেশ।

মজিদ। এই কি নবদ্বীপ! যে পুণ্যভূমি একদিন দিবারাত্র হরিনামে মুখরিত থাকত, আজ সেখানে শ্মশানের নীরবতা। বাংলার পুণ্যতীর্থ শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি এমনি করেই কি বাংলার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে?

আলি আব্বাসের প্রবেশ।

আলি। এই যে মহামান্য শাহজাদা। আমি আপনারই সন্ধান কচ্ছি।

মজিদ। কে? ও—আলি আব্বাস?

আলি। নফরকে চিনতে এত দেরী হল জনাব?

মজিদ। কিছু মনে করো না ভাই। পুণ্যভূমি নবদ্বীপের এই ধ্বংসস্তূপ দেখে মনটা বড় উদাস হয়ে পড়েছিল। তুমি এখনও দেশে ফিরে যাও নি?

আলি। যাব; আগে হোসেন শা'র রক্তে গোসল করি, তারপর।

মজিদ। কেন সাধ করে মরবে পাগল? হোসেন শা'র শক্তির পরিচয়ও তুমি পেয়েছ, বুদ্ধির প্রমাণও কম পাও নি। সমগ্র ভারতে এত বড় সুলতান আজ আর একজনও নেই। শক্রতা

ভুলে যাও হাবশী বীর। যদি এদেশে থাকতে চাও, নবাবের বশ্যতা স্বীকার কর। নবাব নিশ্চয়ই তোমায় ক্ষমা করবেন।

আলি। আপনি বুঝি প্রাণের ভয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন?

মজিদ। প্রাণের ভয়ে নয় আলি আব্বাস। নবাব হোসেন শার অসাধারণ দেশপ্রেম আমায় মুগ্ধ করেছিল। তাই আমি মুক্তকণ্ঠে তাঁকে বাংলার দণ্ডমুণ্ডের মালেক বলে কুর্নিশ করেছিলাম।

আলি। কুর্নিশ আমিও করব, তবে হোসেন শাকে নয়, তার কবরখানাকে।

মজিদ। তা'ত বটেই। বাংলার অনেক দানাপানি তুমি খেয়েছ, বাংলার সর্ব্বনাশ তুমি করবে না ত করবে কে?

আলি। আপনি তাহলে হোসেন শা'র মাসোহারা নিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দেবেন? বিদ্রোহ করবেন না?

মজিদ। না।

আলি। ধিক আপনাকে।

মজিদ। যত পার ধিক্কার দাও। বেগমসাহেবার ইচ্ছাতেই আমি বিদ্রোহের পথে নেমেছিলাম, তোমাদের অনুরোধে নয়। আজ বেগম-সাহেবা বিদ্রোহের নাম শুনলে আঁতকে ওঠেন।

আলি। আপনার মত কাপুরুষকে না পেলেও আমাদের চলবে। টাকাটা দিয়ে দিন।

মজিদ। কিসের টাকা?

আলি। সুবুদ্ধি রায়ের সাত বছরের খাজনা আপনাকে এনে দিয়েছিলাম। সে টাকা ত খরচ হয় নি।

মজিদ। না।

আলি। কোথায় সে টাকা?

মজিদ। নিরাপদস্থানেই আছে।

আলি। টাকাটা আমার চাই।

মজিদ। পাবে না। সে অর্থ নবাবের প্রাপ্য, তাঁকেই দিয়ে আসব।

আলি। তুমি জান না মিঞা, তোমাদের নবাব সুবুদ্ধি রায়ের জায়গীর নিষ্কর করে দিয়েছে।

মজিদ। তাহলে টাকাগুলো সুবুদ্ধি রায়কেই ফেরৎ দেব।

আলি। দিতে হয়, আমি দেব।

মজিদ। তুমি যে দেবে না, সে কথা তুমিও জান, আমিও জানি।

আলি। কোথায় রেখেছ টাকা?

মজিদ। দশ বছর চেষ্টা করলেও তুমি তার সন্ধান পাবে না।

আলি। আলবাৎ পাব। আগে তোমাকে জাহান্নামে পাঠাই, তারপর। [আক্রমণ ও উভয়ের যুদ্ধ]

মজিদ। বর্ব্বর হাবশী, আজই তোমার জীবনের শেষ।

আলি। আলি আব্বাসকে চেন না শয়তান।

[আহত মজিদ পড়িয়া গেলেন, আব্বাস তাহার বুকের উপর তরবারি ধরিল।]

আলি। কোথায় টাকা, বল।

মজিদ। বলব না। বাংলার সর্ব্বনাশ করার আর কোন সুযোগ আমি তোমায় দেব না।

আলি। তবে কবরে যাও কসবীর বাচ্চা।

[মজিদের বুকে তরবারি বিঁধাইয়া দিল।]

সাধারণ নাগরিকের বেশে হোসেন শা'র প্রবেশ।

হোসেন। এ কি! কে তুমি শয়তান?

[আলি আব্বাসের ঘাড়ে ধরিয়া প্রবলভাবে ধাক্কা দিলেন, আলি আব্বাস ছিটকাইয়া পড়িল। বুকে বিদ্ধ তরবারি ধরিয়া মজিদ আর্ত্তনাদ করিলেন।]

মজিদ। আঃ—

[হোসেন মজিদের দিকে ফিরিলেন।]

হোসেন। যেই হও তুমি, খোদার কসম, শয়তানকে কোতল কর। নইলে বাংলার মঙ্গল নেই, মহামান্য নবাবের মঙ্গল নেই।

[আব্বাসের পলায়ন।

হোসেন। কে? শাহজাদা? আপনার বুকে তরবারি বিঁধিয়ে দিলে কে ও শয়তান?

মজিদ। ওর নাম আলি আব্বাস।

হোসেন। হাবশীকুত্তা এখনও বাংলার মাটিতে? আজই তোমায় কবরে পাঠাব। [মজিদের বুক হইতে তরবারি তুলিয়া আলি আব্বাসের দিকে ফিরিলেন।] পালিয়ে গেল? কি আপশোষ। শাহজাদা,—আপনার এই শোচনীয় পরিণাম!

মজিদ। দুঃখ করবেন না। কোন পাপ বৃথা যায় না। আমার পিতার হাতে কারণে অকারণে অসংখ্য লোক প্রাণ দিয়েছে। এ তারই প্রায়শ্চিত্ত।

হোসেন। কথা বলবেন না শাহজাদা। বুক থেকে অজস্র ধারে রক্ত ছুটে বেরিয়ে আসছে।

মজিদ। আসুক। তপ্ত মাটি শীতল হক। জাঁহাপনা,—

উদাসীর মাঠে জোড়া অশ্বত্থ গাছের তলায় সুবুদ্ধি রায়ের দেওয়া বিশ হাজার টাকা আছে। এ টাকা আপনারই প্রাপ্য—আপনি গ্রহণ করে আমায় ঋণমুক্ত করবেন। সেলাম, সেলাম।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

হোসেন। কোন পাপ বৃথা যায় না। এই মৃত্যুপুরীর ইট কাঠ পাথর মাটি সবাই কি এই কথা বলছে? এ কি ভয়াবহ ধ্বংস

বিগ্রহ বক্ষে গীতকণ্ঠে অন্ধ বৈষ্ণবের প্রবেশ।

বৈষ্ণব। গীত

তোমায় নিয়ে বেঁধেছিনু আমার সুখের ঘর,
বিনা মেঘে ডাকল রে বাজ, বইল প্রবল ঝড়।
ঠাঁই নাহি আর, বক্ষে ঢাকি,
কোথায় তোমায় লুকিয়ে রাখি?
চল দোঁহে গঙ্গা-জলে হে মোর পীতাম্বর।

হোসেন। এ দিকে কোথায় যাচ্ছ ঠাকুর? সামনেই যে গঙ্গা।

বৈষ্ণব। তাহলে ঠিকই এসেছি। আমার ঠাকুরকে নিয়ে আমি গঙ্গার জলেই আশ্রয় নেব।

হোসেন। মরবে কেন ঠাকুর?

বৈষ্ণব। হোসেন শার রাজত্বে বৈষ্ণবের ঠাঁই নেই। কত বৈষ্ণবের তুলসীর মালা ছিঁড়ে ফেলে হাড়ের মালা পরিয়ে দিয়েছে, জোর করে গো-মাংস খাইয়েছে। হাজার হাজার বৈষ্ণব দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছে, কত মেয়ে লাঞ্ছনার ভয়ে বিষ খেয়ে মরেছে। গঙ্গায় কত লাশ ভেসে গেছে, তার সংখ্যা নেই। আমি অন্ধ, পালাতে

পারি নি। আমার পীতাম্বরকে বুকে করে পোড়ো ঘরের তলায় লুকিয়ে ছিলাম। সাতদিন ওর ভোগ দিতে পারি নি। দেখতে পেলে মলয় কাজী ওকে আগুনে পোড়াবে। তার চেয়ে আমি ওকে বুকে করে গঙ্গায় ডুবে মরব। যাবার আগে নবাবকে অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি, শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাভূমি নবদ্বীপকে যে শ্মশান করেছে তার যেন আর ঈদের চাঁদ দেখতে না হয়। দস্যুর ছুরিকাঘাতে জানোয়ারের মত যেন তার জীবনান্ত হয়।

[প্রস্থান।

হোসেন। এত দিনের সাধনা সব ব্যর্থ হয়ে গেল? ওঃ—

[নেপথ্যে কুসুম গাহিল।]

গীত।

সুজন মাঝিরে, হাল ধর মোর নায়,
আমার বাওয়া শেষ হল রে অকূল দরিয়ায়।

হোসেন। কে গাইছে? কে তুমি? এদিকে এস।

গাহিতে গাহিতে কুসুমের প্রবেশ।

কুসুম। পূর্ব্বগীতাংশ।

সুজন মাঝিরে, হাল ধর মোর নায়,
আমার বাওয়া শেষ হল রে অকূল দরিয়ায়।

হোসেন। [স্বগত] কুসুম!

[কুসুম গাহিতে লাগিল।]

কুসুম। পূর্ব্বগীতাংশ।

ছোট আমার পানসী নিয়ে সাগর দিলাম পাড়ি,
মরণ দোলায় দোল খেয়েছি, বইতে কি আর পারি?

অবশ আমার অঙ্গ আজি,
দিন হল শেষ, ও ভাই মাঝি,
হাত বাড়িয়ে নাও গো তুলে আমার যত দায়।

হোসেন। কে তুমি? বহিন?

কুসুম। কার এ কণ্ঠস্বর? ও—মহামান্য বঙ্গেশ্বর? তুমি এখানে কেন? নিজের অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি স্বচক্ষে দেখতে এসেছ? দেখ দেখ, ভাল করে দেখ। যদি তোমার সৈনিকদের কোন ত্রুটি হয়ে থাকে, নিজের হাতে তা সম্পূর্ণ করে যাও।

হোসেন। তুমি এখানে কেন এলে বহিন?

কুসুম। তুমি যে ঘরে থাকতে দিলে না। স্বামীর ঘর ভেঙ্গে দিয়েছ, বাপের বাড়ী এসে এক বেলা আলোচাল কাঁচ কলা খেয়ে জীবন যাপন করতে চেয়েছিলাম, তাতেও তুমি বাদ সাধলে।

হোসেন। তোমার পিতা কি তোমায় ঘরে ঠাঁই দেন নি? তবে তুমি কোথায় ছিলে এতদিন?

কুসুম। এইখানে। ভাই-বোনে সব তীর্থ ঘুরেছি, কোথাও দেবতার দেখা পাই নি, পেয়েছিলাম এই নবদ্বীপের শ্রীবাসের আঙ্গিনায়। প্রাণ ভরে গেল। ওই বাদাম গাছের তলায় কুটীর বেঁধে বেশ সুখে ছিলাম। ভাই-বোনে মাদল আর খঞ্জনী বাজিয়ে কীর্ত্তন গান করতুম, আর নগর কীর্ত্তন এলে দূর থেকে নদীয়ার চাঁদ ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখে জীবন কৃতার্থ করতুম।

হোসেন। ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ? তাই বটে। হরিনামের সুরা পান করিয়ে একটা জাতকে নির্বীর্য্য নিষ্কর্ম্মা ক্লীব সাজিয়ে ধ্বংসের মুখে যে ঠেলে দিতে চেয়েছিল, সেই তোমাদের ভগবান?

কুসুম। কি বুঝবে তুমি কূপমণ্ডূক, কত বড় সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ী

এ বৈষ্ণবধর্ম্ম? এ জাতের সব শ্রীবৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করে আছে অস্পৃশ্যতার মহাপাপ! কত চেষ্টাই ত করেছ তুমি, পেরেছ হিন্দুমুসলমানকে এক ঘাটে জল খাওয়াতে?

হোসেন। তা পারি নি সত্য।

কুসুম। তোমার সৈন্য সামন্ত দিয়ে জগাই মাধাইয়ের মত গুণ্ডাদের দমন করতে পেরেছিলে?

হোসেন। না, পারি নি।

কুসুম। পেরেছিল ওই একটা মানুষ। তুমি অস্ত্র দিয়ে বাংলার জাতিভেদের বেড়া উড়িয়ে দিতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছ, আর তিনি নামের সুধা পান করিয়ে সবাইকে জাত ভুলিয়ে দিয়েছেন। তোমার স্বপ্ন যিনি সফল করেছেন, তুমি তাঁরই লীলভূমি শ্মশানে পরিণত করেছ। ধিক তোমাকে হোসেন শা। তোমার অতীতের সব গৌরবকে মুছে দিয়েছে এই একটা অপকীর্ত্তি।

হোসেন। এ কার কথা বহিন? একথা যে আমি অনেক-বার শুনেছি। যে দিন শুনেছি, আমারই দোষে তুমি ঘরছাড়া, সে দিন থেকে বুকের মধ্যে কি অসহ্য যন্ত্রণা বাসা বাঁধল। কোন হেকিম আরাম করতে পারলে না।

কুসুম। পারবে না নবাব।

হোসেন। নীলাচলে একদিন জগন্নাথের মন্দিরের পাশে বসে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। কাছে কেউ ছিল না। মৃত্যুর পদ-ধ্বনি যেন কানে ভেসে এল। চোখ চেয়ে দেখলুম, এক মুণ্ডিত মস্তক সন্ন্যাসী আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আমার সব ব্যথা দূর হয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কে তুমি সন্ন্যাসি?

সন্ন্যাসী হেসে বললেন,—আমি নবদ্বীপের শচীমায়ের ছেলে। আর তাঁকে দেখতে পেলাম না।

কুসুম। শচীমায়ের ছেলে!

হোসেন। আমার তখন মনে হল, নবদ্বীপকে আমি ধ্বংস করতে আদেশ দিয়ে এসেছি। কাল বিলম্ব না করে ফিরে এলাম বাংলায়। কে শচীমা? তাঁর ঘরখানা আছে ত?

কুসুম। আছে। আগুনের সাধ্য নেই তাকে ছাই করে দেয়।

হোসেন। সন্ন্যাসী আমায় ধরা দিলেন না। তাঁর মাকে আমি দেখব। তাঁর ঘর সোনায় বাঁধিয়ে দেব। চেন তাঁকে?

কুসুম। সবাই চেনে শচীমাকে।

হোসেন। কি নাম তাঁর ছেলের?

কুসুম। শ্রীগৌরাঙ্গ।

হোসেন। শ্রীগৌরাঙ্গ!

কুসুম। যাঁর সোনার নবদ্বীপ তুমি ধ্বংস করেছ, তিনিই তোমার দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করেছেন। অবাক হয়ে চেয়ে রইলে কেন? এই এঁদের ধর্ম্ম।

হোসেন। তোমাকে যেন বড় অসুস্থ মনে হচ্ছে। হাঁপাচ্ছ কেন? একি তোমার আঁচলে রক্ত? কি হয়েছে বহিন?

কুসুম। যমালয়ের ডাক এসেছে। ভাই-বোনে ঘরে বসে কীর্ত্তন গান কচ্ছিলাম। তোমার সৈন্যেরা হাতী লেলিয়ে দিলে। খড়ের ঘর মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ল। ভাই আর বাইরের আলো দেখলে না। তিন দিন পরে কে আমাকে টেনে বের করলে। তারপর থেকে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে রক্ত বেরিয়ে আসছে। এতদিন পরে ডাক এল।

হোসেন। আমার সঙ্গে চল বহিন। আমি তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব।

কুসুম। আমার ভাইকে যে খুন করেছে, আমার জীবনটা যে ব্যর্থ করে দিয়েছে, নিরপরাধ বৈষ্ণব সমাজের উপর যে অমানুষিক নির্য্যাতন চালিয়েছে, তার সাহায্যে বেঁচে ওঠার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল।

হোসেন। বহিন!

কুসুম। পাপের বীজ মরে না হোসেন শা। যে পাপ তুমি করেছ, তার ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে। আর সে দিনের বেশী দেরী নেই।

[প্রস্থান।

হোসেন। মূর্খ জ্যোতিষী, মূর্খ চাঁদ কাজী, আর সবার চেয়ে মূর্খ এই নবাব হোসেন শা।

আদিনার প্রবেশ।

আদিনা। জাঁহাপনা, জাঁহাপনা,—এই যে তুমি এখানে।

হোসেন। তুমি কি করে জানলে যে আমি এখানে এসেছি?

আদিনা। আমার মন বলছিল, নিজের অপকীর্ত্তি দেখতে তুমি নিশ্চয়ই একবার নবদ্বীপে আসবে। সাতদিন আগে খবর পেয়েছি তুমি বাংলায় ফিরে এসেছ, অথচ রাজপ্রাসাদে যাও নি। আর আমি অপেক্ষা করতে পারলুম না।

হোসেন। ফকির সাহেবের কবরের মাটি মসজিদে রক্ষা করেছ বেগম?

আদিনা। করেছি। চল, চল, প্রাসাদে চল। কি দেখছ?

হোসেন। দেখছি আমার জীবনব্যাপী সাধনার শ্মশান!

আদিনা। ভাল করে দেখ। একটা শহর কতদিনের চেষ্টায় গড়ে ওঠে। তাকে ভাঙ্গতে দশ দিনও লাগে না। যারা গড়ে, তারাই ত মানুষ। আগে যারা তোমার গুণগানে পঞ্চমুখ ছিল, আজ তারাই তোমার মৃত্যুকামনা করছে। এ যে আমার কি বেদনা, বলে বোঝাবার নয়।

হোসেন। কেঁদো না বেগম। আবার আমি শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাভূমিকে স্বর্গের সুষমায় ভরিয়ে তুলব। যারা মরেছে, তারা আর ফিরবে না। যারা বেঁচে আছে তাদের সুখ সমৃদ্ধির জন্তে আমার রাজভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেব। যারা পালিয়ে গেছে, তাদের সবাইকে পায়ে ধরে ফিরিয়ে আনব। আবার কি বাংলার পাঁচকোটি মানুষ তারস্বরে হোসেন শার জয়গান করবে না?

আদিনা। জাঁহাপনা!

হোসেন। কেন তুমি ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটে এসেছ আদিনা? আমি ভাল আছি, ধন্বন্তরীর হাতের স্পর্শে আমার সব রোগ দূর হয়ে গেছে। কে সেই ধন্বন্তরী জান? শ্রীগৌরাঙ্গ।

আদিনা। শ্রীগৌরাঙ্গ! তুমি তাঁকে দেখেছ?

হোসেন। দেখেছি, তাঁর কথা শুনেছি, তাঁর করস্পর্শ পেয়ে ধন্ত হয়েছি বেগম। চোখের জল মুছে ফেল। আবার আমি মানুষ হব। কি যেন তুমি বলতে চাও বেগম?

আদিনা। সর্ব্বনাশ হয়েছে জাঁহাপনা। আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগে বাপজানের হুকুমে পরাগল খাঁ সসৈন্তে অভিযান চালিয়ে রাজা সুবুদ্ধি রায়ের জায়গীর দখল করেছে।

হোসেন। নিষ্কর জায়গীর দখল করেছে!

আদিনা। শুধু তাই নয়। রাজাকে গোমাংস খাইয়ে এরা তার ধর্ম্মনাশ করেছে।

হোসেন। কেন? কেন?

আদিনা। তোমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে। সুবুদ্ধি রায় নাকি তোমায় চাবুক মেরেছিলেন।

হোসেন। বেশ করেছিলেন। তাতে চাঁদ কাজীর কি? আমার মনিবকে জাতি-ভ্রষ্ট করবে কোথাকার কে পরাগল খাঁ, আর তাকে হুকুম দেবে বৃদ্ধ শয়তান চাঁদ কাজী? এই চাঁদ কাজীর জন্যই নবদ্বীপ আজ শ্মশান হয়েছে। হাজার হাজার নিরপরাধ বৈষ্ণব চোখের জলে বুক ভাসিয়ে চলে গেছে। আমি সুবুদ্ধি রায়ের প্রাসাদে যাচ্ছি বেগম। আমার মনে হচ্ছে, হিন্দু-সমাজ তাঁকে ত্যাগ করেছে। তাঁকে যদি স্বধর্ম্মে ফিরিয়ে আনতে না পারি, তাহলে আবার আমি তাঁর দাসত্ব করব?

আদিনা। এ তুমি কি বলছ?

হোসেন। আমার জন্যে তাঁর ধর্ম্ম যদি যায়, তাঁর জন্যে আমিও রাজদণ্ড ত্যাগ করব। তুমি যাও আদিনা, আমি যদি না ফিরি, নসরৎকে সিংহাসনে বসিয়ে পুরন্দরের সাহায্যে তুমিই রাজ্য-শাসন করো। মনে রেখো, বাঙলা বাঙালীর জন্যে। পাঞ্জাবী-বিহারী-হাবশীর জন্যে নয়।

[প্রস্থান।

আদিনা। বাংলার শ্রীবৃদ্ধি মাঝ-পথে এসে থেমে গেল। দুর্ভাগ্য হিন্দুস্থানের, দুর্ভাগ্য বাংলার।

চাঁদ কাজীর প্রবেশ।

চাঁদ কাজী। এই যে আদিনা। হোসেন কোথায়, হোসেন?

আদিনা। চলে গেছে বাপজান।

চাঁদ কাজী। কোথায়?

আদিনা। সুবুদ্ধি রায়ের কাছে। ফেরাও বাপজান, ফিরিয়ে আন।

চাঁদ কাজী। না, গৌড়ের মসনদে আর তাকে প্রয়োজন নেই।

আদিনা। প্রয়োজন নেই!

চাঁদ কাজী। না। চলে এস আদিনা, হোসেন শা'র রাজত্ব শেষ হয়েছে। এবার আমরা নসরৎকে সিংহাসনে বসাব। আমি সব আয়োজন করেছি।

আদিনা। কার হুকুমে?

চাঁদ কাজী। হুকুম? চাঁদ কাজী হুকুম নেয় না কন্যা, হুকুম দেয়। হোসেনকে আমি হাতে ধরে মসনদে বসিয়েছি। সে যখন মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষা করলে না, তখন আর তার নবাবী করতে হবে না।

আদিনা। চুপ কর রাজদ্রোহি। সুবুদ্ধি রায়কে ধর্ম্মভ্রষ্ট করেছে কে? কোন্ শয়তানের এ ফর্ম্মাণ?

চাঁদ কাজী। শয়তান চাঁদ কাজীর।

আদিনা। মানুষে বোধহয় তোমাকে পয়দা করে নি বাবা! মরতে বসেছ, এখনও তোমার এত জিঘাংসা? ধিক্ তোমাকে শয়তান। পনের বছর তোমার জামাইকে যে দুধ-ভাত খাইয়েছে, একদিন তাকে চাবুক মেরেছে বলে তার ধর্ম্মটা তুমি কেড়ে নিলে? কোথায় ছিলে তোমরা কাজী আর পাজীর দল, যখন এক অপোগণ্ড শিশুকে তার পিতা হিন্দুর কাছে বিক্রি করেছিল? জবাব দাও।

চাঁদ কাজী। কার কাছে জবাব দেব?

আদিনা। বঙ্গেশ্বরীর কাছে।

চাঁদ কাজী। বঙ্গেশ্বরীর মাথায় আমি পয়জার মারি।

আদিনা। কবরে গিয়ে পয়জার মার রাজদ্রোহি। [ছুরি বাহির করিল]

চাঁদ কাজী। আদিনা! [তরবারি বাহির করিয়া আঘাত করিল]

আদিনা। [পড়িয়া গেল] আঃ—হল না জাঁহাপনা, তোমার দুশমনকে খতম করা হল না। সোনার নবদ্বীপ, বুকের রক্তে তোমার মাটি রাঙিয়ে দিয়ে গেলাম। আমার স্বামীর কলংক আমার রক্তে ধৌত হক।

চাঁদ কাজী। আদিনা!

আদিনা। খোদা হাফেজ।

[পিতার সাহায্যে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

শ্মশান।

প্রদীপ হাতে শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। অভিশাপ দাও রাজা, অভিশাপ দাও। যে পাষণ্ড সৈন্যদল লেলিয়ে দিয়ে তোমায় জাতিভ্রষ্ট করেছে, অনুতাপে জলে-পুড়ে সেও যেন তোমারই মত ছাই হয়ে যায়। আর অভিশাপ দাও ধর্ম্মের ধ্বজাধারী সেই পণ্ডিতমূর্খ সমাজপতিদের, যারা বিধান দিয়েছিল যে ধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দুর জলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। [চিতার উপর প্রদীপ রক্ষা করিলেন] কেন তুমি তাদের বিধান মেনে নিলে রাজা? দেশে এমন কি কেউ নেই যে ওই দুটো মানবজাতির শত্রু শিরোমণি আর বিদ্যানিধিকে যমালয়ে পাঠিয়ে দেয়?

পুরন্দরের প্রবেশ।

পুরন্দর। আমি আছি মা। এ মহৎ কাজ আমিই করব, আজই করব। কিন্তু সে মানুষটাকে ত দেখতে পাচ্ছি না। তিনিও কি জলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়েছেন?

শঙ্করী। কে?

পুরন্দর। নবাব হোসেন শা।

শঙ্করী। তুমি বুঝি সেই নবাবের কর্ম্মচারী? তোমার নবাব একদিন আমাদের ক্রীতদাস ছিল,—জান?

পুরন্দর। জানি মা।

শঙ্করী। বুকের রক্ত জল করে একটা শিশুকে বড় করে তুলেছিলাম। নবাব হয়ে সে আমারই মেয়েকে ঘরছাড়া করলে, আমারই স্বামীকে জাতিভ্রষ্ট করলে?

পুরন্দর। বিশ্বাস করুন রাণীমা, বঙ্গেশ্বরের মুখে আজ যত কলঙ্ক তার শতাংশের একাংশও তার প্রাপ্য নয়। সিংহাসনে বসেও তিনি ভুলে যান নি যে তিনি আপনাদের ভৃত্য।

শঙ্করী। আমি তাকে অভিশাপ দিচ্ছি,—

পুরন্দর। না—না, অনেকে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছে, আপনি অভিশাপ দেবেন না রাণিমা। সব আমাদের অপরাধ, তাঁর কোন অপরাধ নেই। যত পারেন, আমাদের মাথায় অভিশাপ বর্ষণ করুন।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। ও রাণীমা, ও রাণীমা, শীগ্‌গির চলে আসুন। একটা পাগল মোছলমান আসছে। রাস্তার লোক তাকে চারিদিক থেকে পাথর ছুঁড়ে মারছে। তবু সে পালিয়ে যাচ্ছে না; খালি বলছে, "বাবাঠাকুর, আমি এসেছি"।

পুরন্দর। কোথায় বাবা? কোনদিকে সে পাগল? আমি তাকে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছি। এস—এস, আমায় দেখিয়ে দেবে এস।

[ভৃত্যের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

হোসেন। [নেপথ্যে] বাবাঠাকুর, বাবাঠাকুর,—

শঙ্করী। কটক বন্ধ করে দাও দ্বারি, শ্মশানভূমিতে বিধর্ম্মীকে প্রবেশ করতে দিও না।

হোসেন শা'র প্রবেশ।

[তাঁহার কপাল কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছিল। সামান্ত বেশবাস ছিন্ন ও রক্তাক্ত।]

হোসেন। ওরে, ছেড়ে দে, আমি পাগল নই। আমি ঘরের মানুষ, ঘরে ফিরে এসেছি। [ছিটকাইয়া আসিয়া পড়িয়া গেলেন]

শঙ্করী। খবরদার, চিতার মাটি স্পর্শ করো না

হোসেন। কার চিতা? কে আবার ছাই হয়ে গেল? তুমি কি মা-ঠাকরুণ? তোমার এ বেশ কেন? আমার বাবাঠাকুর কোথায়, আমার বাবাঠাকুর?

শঙ্করী। কে? মহিমান্বিত নবাব হোসেন শা?

হোসেন। না—না, আমি হোসেন শা নই। আমি তোমাদের গোলামের গোলাম আলাউদ্দিন।

শঙ্করী। গোলামের গোলাম। তাই বটে। আমার জামাইকে খুন করে তোমার গোলামির ঋণ শোধ হয় নি, আমার মেয়েটাকে ঘরছাড়া করেও তোমার তৃপ্তি হয় নি, পরাগল খাঁকে লেলিয়ে দিয়ে মনিবের ধর্ম্মনাশ করলে তুমি?

হোসেন। আমি নই; ওগো, সে আমি নই, আমার দুর্ভাগ্য। কে বলেছে তাঁর জাত গেছে?

শঙ্করী। সমাজপতিরা একবাক্যে বলেছে, যে হিন্দু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গোমাংস মুখে তুলেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন।

হোসেন। জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন! এই সমাজের বিধান!

শঙ্করী। সমাজের বিধান কোনদিন তিনি অমান্ত করেন নি, আজও করতে পারেন নি। ওই দেখ তার পরিণাম।

হোসেন। মরে গেল মা? দুটো দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারলে না? সমাজপতিদের আমি এমনি করে পুড়িয়ে মারব। না—না, কারও গায়ে আর কাঁটার আঁচড় দেব না। এ আমারই দোষ, আমার জন্মলগ্নে শনির দৃষ্টি পড়েছিল। সূতিকাগারে মাকে হারিয়েছি, শৈশবে পিতা আমায় ছিন্ন পাদুকার মত ত্যাগ করেছেন। পিতা বলে জেনেছিলাম মহারাজ সুবুদ্ধি রায়কে। আমাকে উপলক্ষ্য করে তাঁরও এই শোচনীয় পরিণাম! অস্ত্র আন মা-ঠাকরুণ, তোমাদের পরম শত্রু আলাউদ্দিন হোসেন খাঁকে যমালয়ে পাঠিয়ে দাও।

শঙ্করী। ওঠ বাবা, ঘরে ফিরে যাও। সমাজপতিরা দেখতে পেলে তোমাকেও বাঁচতে দেবে না।

হোসেন। বাবাঠাকুর, কথা কও বাবাঠাকুর। আমি এসেছি, সবাইকে ত্যাগ করে তোমার কাছে ফিরে এসেছি। [চিতার উপর লুটাইয়া পড়িলেন]

আলি আব্বাসের প্রবেশ।

আলি আমিও এসেছি কাফের। [হোসেনের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাত] একি!

হোসেন। আঃ—

পুরন্দরের প্রবেশ।

পুরন্দর। কি করলি হাবশীকুত্তা? পালাবার পথ নেই। জাহান্নামে যাও শয়তান। [আলি আব্বাসের পৃষ্ঠে তরবারি বসাইয়া দিল]

আলি। আরে যা পাতিশেয়াল। প্রতিশোধ নিয়েছি, জান ভি দিয়েছি। কুছ পরোয়া নেই। কাফেরকে খতম করেছি, খোদা হামকো দোয়া করে।

[পড়িতে পড়িতে প্রস্থান।

হোসেন। পুরন্দর, কাছে এস। আফশোষ করো না ভাই। যদি পার, আমার মনিবের চিতার কাছে আমায় কবর দিও। নসরৎ রইল, তুমি রইলে দেখো।

পুরন্দর। বাঙলার দরদী বন্ধু, মহিমান্বিত নবাব সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শা, বান্দার শেষ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

শঙ্করী। আলাউদ্দিন!

হোসেন। মা, আমায় ঘরে নিয়ে চল। শৈশবে যেমন করে তোমার কোলে শুইয়ে ঘুম পাড়াতে, তেমনি করে আজও আমায় ঘুম পাড়িয়ে দাও। সুখে থাক বাঙলা, সুখে থাক বাঙলার ভাই-বোন।

[পুরন্দর ও শঙ্করীর সাহায্যে প্রস্থান।